জেরুজালেম

বিশ্বমুসলিম সমস্যা

জেরুজালেম
বিশ্বমুসলিম সমস্যা

ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ শামাউন আলী
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

আল ফুরকান প্রকাশনী

জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা
মূল
ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

অনুবাদ
মুহাম্মদ শামাউন আলী

সম্পাদনা
হারুন ইবনে শাহাদাত

القدس قضية كل مسلم
إعداد : د. يوسف القرضاوى
الترجمة باللغة البنغالية: محمد شمعون على
متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الناشر : الفرقان للطباعة والترجمة والنشر
٤٩١ ، برامغبازار، داكا، بنغلاديش
تلفون : ٠٠٨٨-٠٢-٩٣٣٤١٨٢
جوال: ٠١٧٤٠١٥٩٧٧
القيمة : ٩٠ تاكا فقط
الطبعة الأولى : ذى الحجة ، ١٤٢٦ هـ
يناير ، ٢٠٠٦م

প্রকাশনায়
আল ফুরকান প্রকাশনী
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২, ০১৭৪-০১৫৯৭৭

এফ.পি-১১

প্রকাশ কাল
মাঘ, ১৪১২ সাল
জানুয়ারী, ২০০৬ খৃষ্টাব্দ

মূল্য : ৯০.০০ টাকা মাত্র।

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবিল কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২

JARUZALEM BISHO MUSLIM SAMASHA [Jaruzalem is the Crisis of the MuslimWorld] by Dr. Yousuf Al-Qarzavi, Translated by Muhammad Shamaun Ali, Published by Al-Furkan Publication, 491 Wireless Railgate, Bara Moghbazar, Dhaka-1217, Bangladesh, Tel. 9334182, 0174015977. First Edition: January 2006, Price : Tk. 90.00 Only.

প্রসঙ্গ কথা

আল-কুদস তথা জেরুজালেম আজ ইহুদীদের কবলে। মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। মুসলমানদের প্রথম কিবলা আজ দখলদার ইহুদীদের আগ্রাসনে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। মুসলিম বিশ্বের চোখের সামনে আজ জেরুজালেম কাঁদছে। কিন্তু এ উম্মত যেন আজ নির্বিকার, উদাসীন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর সময় উদ্ধারকৃত এই কুদস আবার ক্রুসেডের আক্রমনের শিকার। আল-আকসাকে প্রায় দেড়শ বছর পদানত করে রেখেছিল ক্রুসেডারা। এরপর সালাহ্ উদ্দীন আইউবী মুক্ত করেছিলেন ক্রুসেডার হায়েনাদের দখল থেকে। আজ আবার যায়নবাদী ইহুদীচক্র আল-কুদসকে (জেরুজালেমকে) দখল করে এর ইসলামী ঐতিহ্যকে মিটিয়ে ফেলার অপঃতৎপরতায় লিপ্ত। কিন্তু আমাদের তথা মুসলমানদের কি কোন দায়-দায়িত্ব নেই? গোটা দুনিয়ার মানুষ কি নির্বিকার চিত্তে এর পতন প্রত্যক্ষ করবে, নাকি এ ব্যাপারে তাদের কোন কিছু করার আছে? এ সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী القدس قضية كل مسلم নামক গ্রন্থে আলোকপাত করেছেন খুবই যুক্তিযুক্ত ও প্রাঞ্জল ভাষায়। আমরা বইটি "জেরুজালেম বিশ্বমুসলিম সমস্যা" নামে বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। বইটি পাঠ করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

ড. ইউসুফ আল-কারযাভীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার তেমন প্রয়োজন নেই। তিনি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের একজন খ্যাতিমান চিন্তাবিদ। বহু ইসলামী গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বর্তমানে কাতারে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তাঁর অনেকগুলো বই বাংলাভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো- ইসলামে হালাল হারামের বিধান, ইসলামে যাকাতের বিধান, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম, ইসলামী শরিয়তের বাস্তবায়ন এবং ইসলামে ইবাদতের পরিধি।

বইটি অনুবাদ ও প্রকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ ও শুকরিয়া, বিশেষ করে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধুবর সরদার ফরিদ আহমদ ও শেখ মুহসিন আলী ভাইয়ের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ আমাদের এ খিদমত কবুল করুন। আমীন॥

ঢাকা,
১০ জিলকদ, ১৪২৬ হিজরী

বিনীত অনুবাদক
মুহাম্মদ শামাউন আলী

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের ওপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন এবং বিশেষ করে সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদের (সা.) প্রতি এবং তাঁর সাহাবাদের প্রতি, যারা ছিলেন হেদায়েতের অগ্রনায়ক এবং ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র। যারা এদের অনুসরণ করেছে তারা সুপথ পেয়েছে। এটি হচ্ছে ইসলামী জাগরণ সিরিজের দশম গ্রন্থ। এতে এমন এক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মুসলমানদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয়ও বটে, আমরা বিশ্বের যে ভূখণ্ডেই থাকি না কেন? আর সেটি হচ্ছে জেরুজালেম (আল-কুদস) সমস্যা। জেরুজালেম আজ ঝড়ের মুখে, এক ধেয়ে আসা বিপদের তোপে, যায়নবাদের কালো থাবার নিচে। যারা আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে, লক্ষ্য স্থির করেছে, নিখুঁত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কুদসকে গ্রাস করার জন্য, একে ইহুদী নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য, এর ইসলামী পরিচিতি মুছে ফেলার জন্য। তারা তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, এতে কোনো রাখঢাক করেনি। তারা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে এবং এজন্য সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলামী উম্মতের পক্ষ থেকে কেউ এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসেনি, যদিও তারা সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন প্রবাদ বাক্যে বলা হয়েছে, ফেরাউনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'তোমার এই উন্মত্ততা কি কারণে?' সে উত্তরে বলেছিল, 'কেউ আমাকে প্রতিরোধ করেনি বলে।'

আমরা এখানে অমনোযোগীদের সতর্ক করতে চাই, ঘুমন্তদের জাগাতে চাই, বিস্মৃতদের স্মরণ করাতে চাই, ভীরুদের সাহস দিতে চাই, দ্বিধাগ্রস্তদের দৃঢ় হতে বলি, খিয়ানতকারীদের মুখোশ উন্মোচন করতে চাই এবং মুজাহিদদের হাতকে শক্তিশালী করতে চাই, যারা আত্মসর্মপণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলেছে আর দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্য অথবা শহীদ হয়ে মরার জন্য।

কুদস শুধুমাত্র ফিলিস্তিনীদের একার নয়, যদিও তারা এর সবচেয়ে বেশি হকদার। এটি আরবদের একার নয়, যদিও তারা এর হেফাযতের প্রথম লোক।

এটি হচ্ছে সকল মুসলমান, সেই মুসলমানের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, দুনিয়ার একেবারে পূর্ব বা পশ্চিমে, উত্তর অথবা দক্ষিণে, সে শাসক হোক বা প্রজা, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, ধনী কিংবা দরিদ্র, পুরুষ অথবা মহিলা জেরুজালেম সবারই, প্রত্যেকের যোগ্যতা ও সামর্থ অনুযায়ী।

হে ইসলামের অনুসারীগণ! আপনারা তৈরি হোন। অবস্থা খুবই গুরুতর। সময় খুবই বিপজ্জনক। জেরুজালেম, জেরুজালেম, জেরুজালেম, আল-কুদস, আল-কুদস, আল-আকসা আল-আকসা!!

«وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ »۔ (التوبة : ١٠٥)

"আর বলে দিন, তোমরা কাজ করে যাও। অবশ্যই আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ তোমাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করবেন। অতঃপর তোমাদেরকে অন্তর্যামীর দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হবে, তখন তিনি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" (সুরা তাওবা : ১০৫)

ইউসুফ আল-কারযাভী

মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসে জেরুজালেম

ইসলামে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জেরুজালেমের অবস্থান অনেক উচ্চে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সকল মাযহাব, ধর্মীয় দল ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লোকজন একমত। এজন্য জেরুজালেমকে রক্ষা ও প্রতিরক্ষা করা সমস্ত মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। এর জন্য আত্মমর্যাদাবোধ, এর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা এবং এর ওপর হামলাকারীকে প্রতিহত করা অপরিহার্য কর্তব্য। যদিও মুসলমান আরব এবং ফিলিস্তিনীরা ইসরাইলের সঙ্গে শান্তির ব্যাপারে মতপার্থক্য প্রকাশ করেছে এই বলে: এদের সাথে শান্তি স্থাপন করা ঠিক হবে, না হবে না? যদি ঠিক হয় তাহলে তা কি সফল হবে, না হবে না? কিন্তু সকলেই কুদস এর ইসলামী ঐতিহ্য ও সম্পদ হবার ব্যাপারে ঐক্যমত। একে ইহুদী আগ্রাসন থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব বলে ঐক্যবদ্ধ। একে ইহুদীকরণ বা এর ইসলামী পরিচিতি বিনষ্ট করতে দেয়া যাবে না। এর ইসলামী ইতিহাস উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্রকে প্রতিরোধ করতে হবে বলে সকলেই ঐক্যবদ্ধ। জেরুজালেম হচ্ছে ইসলামী ঐতিহ্য ও সম্পদ। মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় এটি হচ্ছে প্রথম কিবলা, ইসরা ও মেরাজের স্থান, তৃতীয় সম্মানজনক শহর এবং নবুওয়াত ও বরকতের ভূমি, জিহাদের চারণভূমি। আমরা সামনে এসব ব্যাপারে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ্।

জেরুজালেম : প্রথম কিবলা

একজন মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে, চিন্তা চেতনায় এটা স্পষ্ট যে, জেরুজালেম হলো প্রথম কিবলা। যার দিকে মুখ করে রাসূল (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা নবুওয়াতের দশম বছরে মক্কায় নামায ফরজ হওয়া থেকে শুরু করে মদীনায় হিজরত করার পর দীর্ঘ ষোল মাস পর্যন্ত নামাজ আদায় করছেন যতক্ষণ না কুরআনে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তনের নির্দেশ আসে। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

وَحَيْثُ مَاكُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ »- (البقرة : ١٥٠)

"আর যেখান থেকে বের হয়ে এসেছেন সেদিকেই মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, সেদিকেই মুখ ফিরাও।" (সুরা বাকারা : ১৫০)

মদীনা শরীফে রয়েছে এর ঐতিহাসিক নিদর্শন। একটি মসজিদে মুসল্লীরা একই নামাজের কিছু অংশ জেরুজালেমের দিকে মুখ করে আদায় করেন আর কিছু অংশ মক্কার দিকে। সেই ঐতিহাসিক মসজিদের চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান। এ মসজিদ কালের আবর্তে বহুবার নতুনভাবে তৈরি হয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানগণ আজ পর্যন্ত এ মসজিদ জিয়ারত করছেন এবং এতে নামাজ আদায় করছেন।

মদীনায় ইহুদীরা কিবলা পরিবর্তনের ঘটনায় হুলস্থুল বাধিয়ে দেয়। কুরআন তাদের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করে ঘোষণা দেয়, সমস্ত দিকই আল্লাহর। তিনিই নির্ধারণ করবেন কোন দিকটা কিবলা হবে তাদের জন্য যারা তাঁর উদ্দেশে সালাত আদায় করতে চায়। আল্লাহ বলেন :

«سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ط قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ»- (البقرة : ١٤٢)

"কতিপয় নির্বোধ লোক বলে, তারা যে কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছিল একে কে পরিবর্তন করল? বলুন, পূর্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লাহরই জন্য। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান।" (সুরা বাকারা : ১৪২)

তিনি আরো বলেন :

«وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا اِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ط وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلاَّ عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ»- (البقرة : ١٤٣)

"আমরা এই কিবলাকে এজন্যই পরিবর্তন করেছি যেন জানতে পারি কারা সত্যিকার অর্থে রাসূলের অনুসরণ করে আর কারা পিটটান দেয়। যদিও এটা

এক বিরাট ঘটনা কিন্তু তাদের জন্য নয় যারা আল্লাহর হেদায়েত পেয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের নামাজকে বিনষ্ট করবেন না।" (সূরা বাকারা : ১৪৩)

তারা বলেছিল, মুসলমানদের এই কয় বছরের নামাজ বিফলে গেছে, ব্যর্থ হয়েছে। কেননা তা সঠিক কিবলার দিকে ছিল না। এজন্যই আল্লাহ বলেন : "আল্লাহ তোমাদের নামাজ বিনষ্ট করবেন না।" কেননা তা সঠিক কিবলার দিকেই ছিল যার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ছিলেন সন্তুষ্ট।

জেরুজালেম : ইসরা ও মিরাজের ভূমি

জেরুজালেম হলো ইসলামের চেতনায় 'ইসরা'র ভ্রমণের সর্বশেষ জমিন এবং আসমানে মেরাজে গমনের সূচনা স্থান। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এই বরকতময় 'ইসরা' ভ্রমণ রাতের বেলায় মক্কার মসজিদে হারাম বা কাবা থেকে শুরু হয়, যেখানে রাসূল (সা.) বসবাস করছিলেন এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে মসজিদে আকসায় গিয়ে। এটা কোনো নিছক ঘটনাই ছিল না; বরং এতে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল নবী রাসূলদের সাথে মিলিত হন এবং ইমাম হিসেবে তাদের নামাজে নেতৃত্ব দেন। এর দ্বারাই ঘোষণা হয়ে যায় ইহুদীদের কাছ থেকে বিশ্বধর্মীয় নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়ে নতুন উম্মতের কাছে হস্তান্তরের, নতুন রাসূলের, নতুন কিতাবের, বিশ্ব উম্মত এবং বিশ্ব রাসূল, বিশ্ব কিতাবের। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ»۔(الأنبياء : ١٠٧)

"আপনাকে আমি বিশ্বের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া : ১০৭)

তিনি আরো বলেন :

«تَبَارَكَ الَّذِيْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا»۔(الفرقان : ١)

"বরকতময় প্রভুর প্রশংসা যিনি তার বান্দার ওপর পার্থক্যকারী কিতাব প্রেরণ করেছেন যেন তিনি বিশ্বকে সতর্ক করতে পারেন।" (সূরা ফুরকান : ১)

কুরআনে এই ভ্রমণের শুরুর কথা এবং শেষের কথা স্পষ্ট করে বলে যে সুরার প্রথম আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে সুরা এই ভ্রমণের নাম 'ইসরা' বহন করছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন :

«سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا» -

'প্রশংসা সেই সত্তার যিনি তার বান্দাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশে আমরা বরকত নাজিল করেছি যেন তাঁকে আমাদের নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করাই।' (সূরা ইসরা : ১)

আয়াতে মসজিদে হারামের কোনো গুণাবলী উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু মসজিদুল আকসাকে এই বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে (بَارَكْنَا حَوْلَهُ) 'যার আশে-পাশে বরকত নাজিল করেছি।' যদি এর আশে-পাশে বরকত থাকে তাহলে এর মাঝে বরকত থাকাই অবশ্যই অগ্রগণ্য।

ইসরা ও মেরাজের ঘটনা বিভিন্ন সংকেত ও দলিল প্রমাণে ভরপুর যা এই বরকতময় স্থানের গুরুত্ব বহন করে। যে প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে জিবরাঈল (আ.) বোরাক বেঁধে ছিলেন (এক আশ্চর্যজনক জন্তু যার মাধ্যমে রাসূল (সা.) মক্কা থেকে কুদস পর্যন্ত ভ্রমণ করে ছিলেন) যেন অপর ভ্রমণ থেকে ফিরে আসেন। যে ভ্রমণ শুরু হয়েছিল কুদস বা মসজিদে আকসা থেকে সুউচ্চ আসমানের দিকে সৃষ্টির শেষ প্রান্ত সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত। মুসলমানরা অদ্যাবধি সেই পাথরখণ্ড ও বোরাকের দেয়াল ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষণ করে আসছে।

যদি এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য জেরুজালেম না হতো, তাহলে মক্কা থেকেই সরাসরি আসমানে উঠে যাওয়া যেতো। কিন্তু এই পবিত্র স্টেশন দিয়ে গমন অবশ্যই উদ্দেশ্যপূর্ণ। যেমনটি কুরআন মজীদ এবং হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায়। ইসরার ভ্রমণের ফল হলো : ইসরার শুরুর সাথে শেষের সেতুবন্ধন স্থাপন। আমরা অন্যভাবে বলতে পারি, মসজিদে হারামের সাথে মসজিদে আকসার সেতুবন্ধন স্থাপন। এই বন্ধনের প্রতিক্রিয়া ও আসর একজন মুসলমানের অন্তঃকরণে অবশ্যই প্রতিফলিত হয় যেন এই দুই মসজিদের পবিত্রতা অন্যটির পবিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। যদি কেউ এর একটির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা কার্পণ্য করে তাহলে আশঙ্কা রয়েছে অন্যটির ক্ষেত্রেও সে তাই করবে।

জেরুজালেম : তৃতীয় সম্মানজনক শহর

জেরুজালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাস ইসলামের তৃতীয় সম্মানজনক শহর। প্রথম শহর হলো মক্কা, যাকে মসজিদে হারাম দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। আর ইসলামে দ্বিতীয় সম্মানিত শহর হল মদীনা, যাকে আল্লাহ মসজিদে নববী দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং যাতে রয়েছে নবী করীম (সা.)-এর কবর। আর ইসলামে তৃতীয় সম্মানিত শহর হলো জেরুজালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাস যাকে আল্লাহপাক মসজিদুল আকসা দ্বারা সম্মানিত করেছেন, যার আশে-পাশে তিনি বরকত নাযিল করেছেন। এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) বলেছেন :

" لاَتَشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الاَقْصَى ، وَمَسْجِدِىْ هَذَا " ـ

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হওয়া যাবে না- মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা এবং আমার এই মসজিদ।"

সুতরাং সমস্ত মসজিদই সওয়াবের দিক দিয়ে সমান যে এতে নামাজ আদায় করবে। কোনো মুসলামানেরই উচিত হবে না এমন ভ্রমণের এরাদা করার অর্থাৎ সফরের জন্য এরাদা করবে না যে সেখানে গিয়ে নামাজ পড়বে তা যে কোনো মসজিদই হোক না কেন। কিন্তু এই তিনটি বিশেষ মসজিদে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে হাদীসের শব্দ নির্দিষ্টবাচক। সুতরাং এর ওপর অন্যগুলোকে কেয়াস করা যাবে না। কুরআন মসজিদে আকসার গুরুত্বের কথা এবং তার বরকতের কথা ঘোষণা করেছে, মসজিদে নববী তৈরি করার এবং হিজরতের কয়েক বছর আগেই। হাদীস শরীফে কুরআনের বক্তব্যকে জোর দিয়ে সমর্থন করা হয়েছে আমাদের উল্লেখিত হাদীসে। অন্যান্য হাদীসে এসেছে :

" اَلْصَلاَةُ فِى الْمَسْجِدِ الاَقْصَى تَعْدِلُ خَمْسَمَائَةِ صَلاَةٍ فِىْ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ ، مَا عَدَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ النَّبَوِىْ " ـ (متفق عليه)

"মসজিদুল আকসায় এক রাকাত নামাজ আদায় অন্যান্য মসজিদের তুলনায় পাঁচশ গুণ, মসজিদে হারাম এবং মসজিদে নববী ব্যতীত।" (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীমকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হয়, দুনিয়ার বুকে সর্ব প্রথম কোন মসজিদ তৈরি করা হয়? তিনি বলেন, মসজিদে হারাম। বলা হয়, এরপর? তিনি বলেন, মসজিদুল আকসা। (বুখারী, মুসলিম)

ইসলাম যখন মসজিদুল আকসাকে তৃতীয় সম্মানজনক মসজিদ বলে ঘোষণা দিয়েছে, তখন একে সম্মানিত দুই মসজিদের সাথেই পবিত্র বলেও অবহিত করেছে মক্কা ও মদীনার মতো। আর এর উদ্দেশ্য হলো এক নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতির স্বীকৃতি, তা হলো- এটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বিনষ্ট বা ভেঙে ফেলা যাবে না। একে পূর্ণ হেফাযত করতে হবে। অবহেলা বা অপব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। সুতরাং কুদস ছিল নবুওয়াতের ভূমি আর মুসলমানেরাই হলো নবী রাসূলদের ব্যাপারে বেশি হকদার, যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনার ইহুদীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন : "আমরাই মুসার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশি হকদার।"

জেরুজালেম : নবুয়ত ও বরকতের ভূমি

আল-কুদস ফিলিস্তিনের একখণ্ড ভূমি। এটি সর্বোৎকৃষ্ট জমীন এবং মূলভূমি। মহান আল্লাহ এই ভূমিকে পূণ্যময় বা বরকতময় বলে তাঁর কিতাবে পাঁচ স্থানে উল্লেখ করেছেন :

প্রথমত ইসরার আয়াতে যখন মসজিদুল আকসাকে গুণান্বিত করেন (اَلَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهُ) "যার আশে পাশে আমি বরকত নাযিল করেছি" বলে।

দ্বিতীয়ত যখন তাঁর প্রিয় বন্ধু ইবরাহীমের ঘটনা বর্ণনা করেন তখন বলেন,

«وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا اِلَى الاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ»۔ (الانبياء : ٧١)

"আর আমরা লুতকে পরিত্রাণ দেই এমন এক ভূমিতে যাতে আমি বরকত নাজিল করেছি বিশ্ববাসীর জন্য।" (আম্বিয়া : ৭১)

তৃতীয়ত হযরত মুসার (আ.) ঘটনায়। ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী ডুবে মরার পর বনী ইসরাইল সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِى بَارَكْنَا فِيْهَا ط وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى

عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا - (الاعراف : ١٣٧)

"আমরা সেই কওমকে পূর্ব ও পশ্চিমের ভূমির উত্তরাধিকার দান করি যারা ছিল দুর্বল, এমন ভূমি যাতে আমি বরকত দিয়েছিলাম এবং আপনার রবের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছিল সুন্দরভাবেই বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে তাদের ধৈর্যের কারণেই।" (সুরা আ'রাফ : ১৩৭)

চতুর্থত হযরত সুলায়মান (আ.) এর ঘটনায়। মহান আল্লাহ তাকে যে রাজ্য দান করেছিলেন এবং সবকিছুকে তার আজ্ঞাবহ করে দিয়েছিলেন যা আর কাউকে দেয়া হয়নি। যেমন বাতাস ছিল তার আজ্ঞাবহ। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ عَاعِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهِ اِلَى الاَرْضِ الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا - (الانبياء : ٨١)

"আর সুলায়মানের জন্য বাতাসকে ঝঞ্ঝাস্বরূপ যা তার নির্দেশে পরিচালিত হতো সেই ভূমির দিকে যাতে আমরা বরকত নাজিল করেছি।" (সুরা আম্বিয়া : ৮১)

পঞ্চমত সাবা এর ঘটনায় যে তাদেরকে আল্লাহ কিভাবে সুখ ও শান্তিতে রেখেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন :

«وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ ط سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِىَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ»-

"তাদের এবং যেসব জনপদের লোকদের প্রতি আমরা বরকত (অনুগ্রহ) নাযিল করেছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তী স্থানে অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং সেগুলোতে ভ্রমণ নির্ধারিত করেছিলাম। তোমরা এসব জনপদে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমণ করো।" (সুরা সাবা : ১৮)

যে জনপদে আল্লাহ বরকত নাজিল করেছিলেন তা হলো শাম (বৃহত্তর সিরিয়া) ও ফিলিস্তিন।

প্রখ্যাত মুফাস্‌সীরে কুরআন আল্লামা আলুসী বলেন, এই জনপদ বলতে শামকে বুঝানো হয়েছে যাতে বরকত নাজিল করা হয়েছিল, যাতে ছিল প্রচুর বৃক্ষরাজি ও ফলমূল এবং এর জনগণ ছিল প্রাচুর্যে মগ্ন।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : এ জনপদ হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। ইবনে আতিয়া (রহ.) বলেন : মুফাস্‌সেরীনরা এর ওপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন। (রুহুল মা'আনী, খ. ২২, পৃ. ১২৯)

কুরআনের বিখ্যাত মুফাস্‌সীরে কেরামগণ -বর্তমানের এবং পূর্বের যুগের- কুরআনের এ বাণীর মমার্থ-

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ - وَطُوْرِ سِنِيْنَ - وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ -

"ডুমুর, জয়তুন, সীনাই পর্বত এবং এই নিরাপদ নগরীর শপথ।" ডুমুর ও জয়তুন বলতে সেই ভূমি বা এলাকাকে বুঝান হয়েছে যাতে এসব উৎপন্ন হয়ে থাকে আর তা হল বায়তুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেম।

ইবনে কাসীর বলেন, কতিপয় আলেম বলেছেন, তিনটি স্থানে মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ রাসূলদের প্রেরণ করেছিলেন : ১. বায়তুল মুকাদ্দাস, যেখানে হযরত ঈসাকে (আ.) প্রেরণ করেছিলেন, ২. সিনাই পর্বত, যেখানে আল্লাহ হযরত মূসার (আ.) সাথে কথা বলেছিলেন এবং ৩. মক্কা, নিরাপত্তার শহর। যে কেউ এতে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে। এই ব্যাখ্যার দ্বারাই এই বিভক্তির মাঝে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। সুতরাং নিরাপদ শহর বলে মুহাম্মদের রিসালাত তথা ইসলামের উৎপত্তিস্থলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সিনাই পর্বত বলে মুসার রেসালাত ইহুদীবাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর ডুমুর ও জয়তুন বলে ঈসার রেসালাতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার উত্থান হয়েছে বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্বদেশ থেকে এবং তিনি তাঁর বিখ্যাত ভাষণ দিয়েছিলেন জাবালে জয়তুন বা জয়তুন পর্বত থেকে। (তাফসীরে কাসেমী ১৭/৯১৯৬। তিনি উল্লেখ করেন, ইবনে কাসীর যে কথার উল্লেখ করেছেন সেটি মূলত শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কথা।)

জেরুজালেম : জিহাদের ভূমি

জেরুজালেম মুসলমানদের কাছে জিহাদের পবিত্রক্ষেত্র। কুরআনুল কারীমে মসজিদুল আকসার কথা বলা হয়েছে। হাদীসে এতে নামায আদায়ের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং শুভ সংবাদ দেয়া হয়েছে যে মুসলামানরা একে জয় করবে এবং এটি মুসলমানদের করতল গত হবে। তারা এই মসজিদে আল্লাহর ইবাদত ও নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রা.) সময় কুদস বিজয় হয়। এর নাম ছিল ইলয়া। এর প্রধান

ধর্মযাজক সাফবিউনুস শর্তারোপ করেছিলেন যে, সে এই শহরের চাবি একমাত্র খলিফার হাতেই সমর্পন করবে, অন্য কারো হাতে নয়। হযরত উমর তাঁর ঐতিহাসিক সফরে এখানে এসে পৌছান এবং চাবি গ্রহণ করেন। (তিনি সারাটি পথ তার গোলামের সাথে ভাগাভাগি করে উটের পিঠে চড়ে আসেন। যখন তিনি জেরুজালেম এসে পৌছান তখন উটের ওপর বসা ছিল তার গোলাম। লোকজন গোলামকে খলিফা মনে করে অভ্যর্থনা করতে এসে দেখে হযরত উমর উটের লাগাম ধরে হেঁটে আসছেন আর উটের ওপর গোলাম বসে আছে। এ ঘটনাটি সকলকে হতবাক ও অভিভুত করে দেয়।) তিনি খৃষ্টানদের সঙ্গে এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন যা আজো ইতিহাসে "উমর চুক্তি" নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এতে তাদেরকে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। এই চুক্তিপত্রে বেশ কয়েকজন মুসলিম নেতা সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ, আবদুর রহমান বিন আউফ, আমর ইবনুল আস এবং মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (তারীখে তবারী, দারুল মাআ'রিফ প্রকাশনী, মিসর, খ. ৩, পৃ. ৬০৯)

মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মদকে (সা.) জানিয়েছিলেন যে, এই পবিত্র ভূমিকে শত্রুরা দখল করে নিবে বা একে আক্রমণ ও দখল করার হুমকি দিবে। এজন্য তিনি তাঁর উম্মতকে একে পাহারা দেয়ার জন্য, রক্ষা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং এর প্রতিরক্ষার জন্য জিহাদ করতে আদেশ করেছেন যেন তা শত্রুর হাতে না চলে যায়। যেমনটি নবী করীম (সা.) ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের সংগঠিত যুদ্ধের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানদেরই বিজয় হবে এবং সব কিছুই মুসলমানদের পক্ষে হয়ে যাবে এমনকি গাছ ও পাথরও সরাসরি কথা বলে বা প্রমাণ দিয়ে শত্রুর অবস্থান বলে দিবে। (এখানে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা ইবনে উমর ও আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।)

হযরত আবু উমামা আল বাহেলী (রা.) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা.) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল সর্বদা হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে শত্রুদেরকে দাবিয়ে রাখবে, এদের বিরোধীতা করে কেউ এদের ক্ষতি করতে পারবে না, তবে কিছু দুর্ভোগ (কষ্ট) দিবে এভাবে যতক্ষণ না আল্লাহর ফয়সালা আসে। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা তখন কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাসে এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উপকণ্ঠে। (আহমাদ ৫/২৬৯; তবারানী ৭/২৮৮)

জেরুজালেমকে ইহুদীকরণ

১৯৯৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর লন্ডনের ইসলামী গবেষণা কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে জেরুজালেম সম্পর্কে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমাকে আহবান জানানো হয় এবং এতে আলোচনা পেশ করার আমন্ত্রণ করা হয়। আমি এ সম্মেলনে উপস্থিত হই এবং আমার আলোচনার শুরুতেই বলি, এই বছরই (১৯৯৭ সাল) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহ জমা হয়েছে যা কুদস ও ফিলিস্তীন সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত এবং আমাদের প্রধান সমস্যা।

এ বছরই যায়নবাদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার শতবার্ষিকী। সুইজারল্যান্ডের বাজেল শহরে হার্টঝেল এর সভাপতিত্বে ১৮৯৭ সালে আন্তর্জাতিক যায়নবাদের প্রকাশ ঘটে।

তেমনি এবছরই হলো ঘৃণিত ও কুখ্যাত বেলফোর ঘোষণার ৮০ তম বার্ষিকী, যাতে ফিলিস্তীনে ইহুদীদের জন্য রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৯৭ সাল হলো ফিলিস্তীনকে দ্বিখণ্ডিত করার ৫০ তম বার্ষিকী, ১৯৪৭ সালে যা ছিল ইসরাঈল প্রতিষ্ঠারই ভূমিকা। এর পরের বছরই ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের জন্ম হয়। কুদস, পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা দখল করার ৩০ বছর পূর্তি হলো ১৯৯৭ সাল। ১৯৬৭ সালে মাত্র ছয় দিনের যুদ্ধে, ইসরাইল এইসব এলাকা দখল করে নেয়।

সর্বশেষ হলো প্রেসিডেন্ট সাদাতের ইসরাইল সফরের ২০তম বার্ষিকী (১৯৭৭-১৯৯৭) যা ইসরাইলের বিপক্ষে আরব ঐক্যে ফাটলের শুরু বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

আমরা এখন এসব তিক্ত ঘটনাবলীর ফলাফল পর্যালোচনা করব। এর ফলাফল খুবই মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক। ইসরাইলের ইসলামী কুদসকে ইহুদীকরণের প্রচেষ্টা, তাদের নির্ধারিত পরিকল্পনা ও সূক্ষ্ম পদক্ষেপের মাধ্যমে করে যাচ্ছে। দুইশ পঞ্চাশ মিলিয়ন আরবের চোখের সামনেই, যদিও তাদের সাথে রয়েছে হাজার হাজার মিলিয়ন মুসলমান এবং জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত। তারপরও বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি আজকের দুনিয়ার

মোড়ল আমেরিকা এ কাজে ইহুদীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করছে। ইসরাইল মসজিদুল আকসার নিচ দিয়ে খনন কার্য অব্যাহত রেখেছে এবং এর নিচে এক পর্যটন নগরী গড়ে তুলছে। আমি আল-কুদসের উক্ত সম্মেলনে দখলীভূমির উমে ফাহম পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ইসলামী আন্দোলনের নেতা শায়খ রায়েদ সালাহ এর কাছে শুনেছি। তিনি এই খনন কার্য দেখার অনুমতি পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছেন যে, কিছু দিনের মধ্যেই যে কোন মুহুর্তে মসজিদুল আকসা ধ্বসে পড়তে পারে।

আমি বার বার বলে আসছি যে, ইসরাইল ভালভাবেই জানে কখন মসজিদুল আকসা ধ্বসে পড়বে। এটা নির্ধারণ করাই আছে, এখন শুধু ঘোষণার অপেক্ষা। সে এ কাজের জন্য উপযুক্ত সময়ই নির্ধারণ করবে যখন আরব আর মুসলমানেরা এমন এক সমস্যা নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে যখন এ ব্যাপার নিয়ে তেমন কিছুই করতে পারবে না। হয়ত সামান্য চিল্লা-চিল্লি লাফ-ঝাপ করবে যার দ্বারা না পারবে হক প্রতিষ্ঠা করতে, আর না পারবে বাতিলের মোকাবিলা করতে। আর সে সময় বিশ্ববাসীও অন্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবে হয়ত বা সে সমস্যা বা সংকট ইসরাইল কিংবা বিশ্ব যায়নবাদেরই পরিকল্পনায় বা ইশারায় ঘটবে।

এভাবেই ইসলামী কুদস, পবিত্র শহর, নবুওতের পূণ্যভূমি, ইসরা ও মেরাজের দেশ, মসজিদুল আকসার স্থান যার আশেপাশে বরকত নাজিল করা হয়েছে, যা মুসলমানদের চোখের মনি এবং হৃদয়ের স্পন্দন তা আজ ইহুদীকরণের শিকার, এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে, এক সুগভীর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ। এর নিচ দিয়ে বিভিন্ন ক্যানেল ও সুড়ঙ্গ খনন করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য হল একে ধ্বংসে করে এর উপর ইহুদী স্তম্ভ স্থাপন করা।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্পষ্ট, পরিকল্পনাও সবার জানা এবং কর্মকান্ড স্বঘোষিত। দুনিয়ার সব ইহুদী এ ব্যাপারে ঐকবদ্ধ, সে যে মতেরই অনুসারী হোকনা কেন, গোঁড়া ধর্মান্ধ বা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, সে লিকুদ পার্টির গোঁড়া ধর্মান্ধই হোক বা শ্রমিক দলের চানক্য নীতির অনুসারী হোক।

এতদসত্ত্বেও আমরা বাতাসের আগে ছুটে চলেছি সুদূর পরাহত শান্তির দিকে। এতে না হবে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন আর না ফেরত আসতে পারবে বহিস্কৃতরা, আর না এর পবিত্রতা রক্ষা করতে দেয়া হবে। আর না দেয়া হবে

একে রাজধানীর মর্যাদা এই বঞ্চনা ও স্পষ্ট জুলুম সত্ত্বেও ইসরাইল ও বেন ইয়ামীন নেতানিয়াহু শান্তির বল দু'পা দিয়ে ঠেলছে। অবস্থা হল নিহত ব্যক্তি রাজি কিন্তু হত্যাকারী সন্তুষ্ট নয়!

এভাবে আমরা আমাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে যতই সরে আসবো ইসরাইল তার বাতিল দাবীর প্রতি আরো অনড় হবে। সে প্রতিদিনই যা ইচ্ছা তা-ই আমাদের নিকট থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে আর আমরা একটা কানাকড়িও আদায় করতে পারছি না। শুধু পাচ্ছি ওয়াদা আর অঙ্গীকার। কবি সত্যই বলেছেন ঃ

সেতো অনেক ওয়াদা করেছিল
কিন্তু তার ওয়াদা ছিল মিথ্যা।
তার ওয়াদা অঙ্গীকার যেন ধোকায় না ফেলে
আশা ও স্বপ্নতো বিভ্রান্তি বৈ-ই কিছু নয়।

বরং লিকুদ পার্টির আমলে ইসরাঈল ওয়াদার ধারও ধারেনা, যদিও ওয়াদা হল মরীচিকার সমতুল্য। বরং সে তার গোয়ার্তুমী ঔদ্ধত্য দেখিয়েই যাচ্ছে, সরাসরি সব কিছু প্রত্যাখান করছে। তার কোন ভয়ভীতিও নেই। কোন লজ্জাও করে না। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন ঃ মানুষেরা নবুওয়তের যে প্রাথমিক বাণী পেয়েছিল তাতে রয়েছে, "যদি তুমি লজ্জা না কর, তাহলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পার।" (বুখারী, মুসলিম) ইসরাইল আজ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে এবং অন্যায়ভাবে সবকিছু গ্রাস করছে। কেননা কেউ তাকে বাধা দিচ্ছে না এবং তার গতিরোধ করছে না।

সে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে শান্তি চায়, নিজস্ব স্বার্থ মোতাবেক এবং তার সম্প্রসারণবাদী স্ট্রাটিজি মোতাবেক, তার আঞ্চলিক বৃহত্তম ইসরাইল গড়ার যে ইসরাইলের সীমানা হবে ফোরাত থেকে নীল নদ পর্যন্ত এবং ধানের দেশ থেকে খেজুরের দেশ পর্যন্ত। কিন্তু সে কখনো একে গোপন করে আবার কোন কোন সময় এথেকে চুপ থাকে, তার চলার নীতি হল ধীরে (STEP BY STEP) যা ইসরাইল বহু যুগ থেকে ভালভাবেই রপ্ত করতে জানে।

বর্তমান বিশ্বের অবস্থা, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পরিস্থিতি ইসরাইলকে তার এই ঔদ্ধত্য ও বর্বরতা বজায় রাখতে সহায়তা করছে যা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি এবং এ পরিস্থিতির প্রতিফল দেখা যাচ্ছে ফিলিস্তিনী আত্মসমর্পনের মাধ্যমে, আরবদের ব্যর্থতা এবং মুসলমানদের দুর্বলতার মাধ্যমে, আর বিশ্ব

বিবেকের অনুপস্থিতি এবং আমেরিকার অন্ধ সমর্থন ও পক্ষপাতিত্বের দ্বারা।

কিন্তু ইসরাইল কি নিশ্চিত যে, এই সহায়ক পরিস্থিতি তার চিরদিন অব্যাহত থাকবে? সেকি পাকা দলিল হাতে পেয়েছে যে বাতাস তার অনুকূলেই থাকবে?

আমরা আল্লাহর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস এবং বিশ্বের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বিশ্বাস করি যে, দুনিয়া পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নশীল। আমাদের চারপাশের বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে বরং আমাদের কল্পনারও বাইরে দ্রুতগতিতে পরিবর্তন ঘটছে। যেমনটি আমরা দেখলাম সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের উত্থান এবং বিশ্বে নতুন অর্থনৈতিক শক্তির উপস্থিতি। আগের যুগের মানুষেরা এটাকে এভাবে বলেছেন, "বর্তমান অবস্থা চিরস্থায়ী নয়।" কুরআন মজীদে সৃষ্টির চিরন্তন পদ্ধতিকে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে ঃ

«وَتِلْكَ الاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ»۔ (آل عمران : ١٤٠)

"এবং এই দিনগুলোকে আমরা মানুষের মাঝে আবর্তিত করে থাকি।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০)

একথা বলা হয়েছে ওহুদ যুদ্ধের পরে যখন নবুওয়তের যুগেও মুসলমানেরা ভেঙ্গে পড়ে এবং ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। ইতিপূর্বে তারা বদরে বিজয় লাভ করেছিল, যাকে কুরআনে ইয়াওমাল ফুরকান বা সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী দিন বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর বাণী,

«يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ»۔ (الانفال : ٤١)

"সত্য মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী দিন। যেদিন দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল ।" (সূরা আনফাল ঃ ৪১)

ফিলিস্তিনী আত্মসর্মপণ

ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের আত্মসর্মপণে অনেকের মাঝেই দুর্বলতা ও হতাশা এসে দানা বেঁধেছে। আশা ভঙ্গের কারণে অনেকেই গভীর মানসিক বিপর্যয়ে নিপতিত। অনেকেই আবার আমেরিকার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে অনেকেই আমেরিকার বর্বরতার ব্যাপারে আতংকিত। কেননা আমেরিকা সর্বদা তার পোষ্য ইসরাইলের পক্ষে ওকালতী করছে। তাছাড়া জিহাদের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং তা অনেক কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠায় যার জন্য অনেক কোরবানীও দিতে হয়েছে। এ ধরনের অনেক কারণে কিছু সংখ্যক

ফিলিস্তিনী নেতা ইহুদীদের অলীক শান্তির ফাঁদে পড়েছেন। ইসরাইল যে শান্তির তকমা দেখাচ্ছে তার শিরোনাম "ভূমির পরিবর্তে শান্তি।" এর অর্থ হল ইসরাইল ফিলিস্তিনী, সিরিয়া এবং লেবাননের ভূমি ছেড়ে দিবে শান্তির বিনিময়ে যা সে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দখল করেছিল, যেন কেউ তার সাথে আর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত না হয়। সংক্ষেপে এর অর্থ হল, আরবদের ভূমি ইসরাইলের শান্তির বিনিময়ে। এর অর্থ দাঁড়ায়, যে ভূমি সে অস্ত্রের বলে জোর করে দখল করেছে সেই তার প্রকৃত মালিক বনে গেছে এবং এতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এখন সে এটা ফেরত দিচ্ছে যেন ওরা শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে ধন্য হয়। আরবেরা আলোচনায় সম্মত হয়েছে এই পঙ্গু নীতির ওপর এবং ইসরাইলকে নিরাপত্তা দিয়েছে। ট্রাম্পকার্ড কুটিল জুয়াড়ীর হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছে।

এ শান্তির অর্থ কি? যাতে বড় বড় মূল সমস্যাগুলোকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ঃ

– কুদস সমস্যা

– বসতি স্থাপন সমস্যা

– উদ্বাস্তু সমস্যা

– সীমান্ত সমস্যা

এসব কঠিন সমস্যা ঝুলন্ত এবং পরবর্তী সময়ের জন্য ফেলে রাখা হয়েছে। আলোচনার শেষ পর্যায়ে এ নিয়ে কথাবার্তা হবে। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করছে না, যদি শেষে আমরা ঐক্যমতে পৌছতে না পারি তাহলে অবস্থা কি হবে?

প্রকৃত পক্ষে এসব সমস্যা আরবদের নিকট ঝুলন্ত, কিন্তু ইসরাঈলের নিকট তা ঝুলন্ত নয়। ইসহাক রবিন অসলো চুক্তির নৈশভোজে ঘোষণা করে বলে, 'আমরা আপনাদের নিকট ঐতিহাসিক ওরশলীম (জেরুজালেম) থেকে এসেছি যা (বৃহত্তর) ইসরাইলী জনগণের জন্য চিরদিনের আবাস ভূমি।'

তেমনিভাবে সে বসতি স্থাপনের ব্যাপারটিও পিছিয়ে রাখেনি বরং ফিলিস্তিনের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করেই যাচ্ছে (যেমন হারহুমা, পূর্ব জেরুজালেম, রাসূল আমুদে)। এসব বসতিতে সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন ঘটিয়েই যাচ্ছে। অথচ এখনও ফিলিস্তিনীদেরকে যারা এদেশের বাসিন্দা কোন ধরনের সম্প্রসারণ বা উন্নয়ন করতে দিচ্ছে না। আমরা স্বচক্ষে দেখলাম ইসরাঈল ফিলিস্তিনীদের শত শত বাড়িঘর ধ্বংস করে দিচ্ছে আজ পর্যন্ত এ সবের ব্যাপারে সামান্যতম ছাড় দেয়নি।

ফিলিস্তিনীরা আজ বুঝতে পেরেছে যে, ইসরাইল তাদেরকে নিয়ে খেলছে, তাদেরকে ধোকা দিয়েছে এবং আংশিক প্রত্যাহার ছিল বিরাট প্রতারণা বৈ কিছু নয়। সে ইচ্ছা করলে এ স্থানকে মাত্র কয়েক ঘন্টায় আবার দখল করে নিতে পারে। কাজের কলকাঠি ও লাগাম এখন সম্পূর্ণ তার হাতে। এ ব্যাপারে কারো কোন কিছু করার নাই। আর ইসরাইল ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষকে যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দিয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো, ফিলিস্তিনীরা যেন নিজেরা মারামারি করে। নিজেরা হানাহানিতে লিপ্ত হয়। আর সে তামাশা দেখে ভাইয়ে ভাইয়ে কাটা-কাটি ও মারা-মারির। ফিলিস্তিনীদের বন্দুক যেন জবরদখলকারীর বুকে আর তাক না করা হয়। বরং তা করা হয় তারই মত আরেক ফিলিস্তিনীর বুকে। আর এটিই ইসরাইলের মূল উদ্দেশ্য।

ইসরাইল যা চেয়েছিল যখন তা পুরাপুরী বাস্তবে ঘটেনি তখন সে প্রকাশ্যে দাবী করে যেন ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ হামাসকে ধ্বংস করে, এর সব শক্তিকে নির্মূল করে এবং ইসরাইল এ ব্যাপারে সহায়তা করবে। আজকে এটিকেই সে প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বানিয়েছে শান্তি আলোচনার টেবিলে ফিরে আসার জন্য।

ইসরাইল তার কুদসকে ইহুদীকরণ পরিকল্পনায় এগিয়েই যাচ্ছে। তার এই পরিকল্পনা আজ বা গতকাল নেয়া হয়নি। সে তার পরিকল্পনা নিয়ে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের এলাকায় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। একেরপর এক বসতি গড়েই যাচ্ছে। আবু গরীবে বসতি স্থাপন করল। রাসুল আমুদ দখল করল। আরবরা বিক্ষোভ করল, নিন্দা জানাল, প্রতিবাদ করল। ইসরাঈল জানে আরবদের প্রতিবাদ না পারবে তাকে টলাতে, আর না পারবে তার কোন পদক্ষেপকে সামান্য বাধাগ্রস্ত করতে। তাদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ কয়েকদিন পর বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

ইসরাইলের সামনে ভয় করার কিছুই নেই একমাত্র সে যুবকরা ছাড়া, যারা জীবনকে বাজী রেখেছে, আল্লাহর জন্য নিজেদের জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা কোনই ভ্রুক্ষেপ করে না যে, মরণ তাদের উপর এসে পড়ল, না তারাই মৃত্যুতে ঝাঁপ দিল। এরা হল তারাই যারা শহীদী আক্রমনের মাধ্যমে ইসরাইলকে কাঁপিয়ে তুলেছে এবং তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করেছে। তাদের চোখের ঘুম হারাম করে দিয়েছে। আসলে লোহাকে উঠাতে, লোহা-ই লাগবে।

এজন্যই ইসরাইল উচ্চ পর্যায়ে এসব বীরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সে হত্যা করেছে ড. শাকাকীকে, ইঞ্জিনিয়ার ইয়াহইয়া আইয়াশকে এবং সর্বশেষ খালেদ মাশআলকে উন্নত রাসায়নিক অস্ত্রের মাধ্যমে এক চুক্তিবদ্ধ দেশে (জর্ডানে) যেন সবাই জানতে পারে যে, এরা এমন এক জাতি যাদের কোন ওয়াদা অঙ্গীকার নাই। মহান আল্লাহ এদের পূর্বপুরুষদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

«اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لَا يَتَّقُوْنَ»۔ (الانفال : ٥٦)

"যাদের সাথে আপনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন এরপর এরা প্রতিবারই চুক্তিভঙ্গ করেছে। এরা (এ ব্যাপারে) কোনই ভয় করে না।" (সূরা আনফাল ঃ ৫৬)

এরা যুগ যুগ ধরে তাদেরকে হত্যা করে আসছে যারাই তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিম্বা তাদের পরিকল্পনা ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয়। সে ব্যক্তি রাজনীতিবিদ হোন বা সাধারণ কিংবা বুদ্ধিজীবী বা লেখক। তারা হত্যা করেছে লর্ড মোয়েনকে, হত্যা করেছে লর্ড বার্নাডোকে এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইসমাঈল ফারুকী ও তার স্ত্রীকে জঘন্য ও নির্মম পদ্ধতিতে হত্যা করেছে (ইতিমধ্যে তারা হামাসের আধ্যাত্মিক নেতা আহমাদ ইয়াসীন এবং ড. আবদুল আজীজ রানতেসীকে হত্যা করেছে)। তারা তাদেরকেই হুমকী দিচ্ছে যারা এমন কথা বলে যা ইসরাইল পছন্দ করে না, এমনকি তারা একাডেমিক ও গবেষণা পত্রকেও বরদাশত করে না, যা তাদের বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে উল্লেখ করছে। অবস্থা এমনই যে, তারা তাদের লেখকরা পর্যন্ত বিভিন্ন হুমকী ধমকীর মুখোমুখি হচ্ছে, বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে চাপের সম্মুখীন হচ্ছে এর সর্বশেষ উদাহরণ হল বিখ্যাত ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবী রোজে জারুদী।

যারা আজো জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে ঘুরছে, জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত, তারা সেই সব মর্দে মুজাহিদ যারা কুদস, মসজিদে আকসাকে মুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবনকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন তারা হল হামাসের লোকজন এবং তাদের সহযোগীরা তারা তাদের জীবন ও সম্পদকে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছে জান্নাতের বিনিময়ে। তারা জেল জুলুম, হত্যা, নির্যাতনকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে একটুও দমেনি ভীত সন্ত্রস্তও হয়নি।

ধৈর্য ধরেছে, ধৈর্যের জন্য চেষ্টা করছে এবং পাহারা দিচ্ছে ইসলামী ঐতিহ্যকে রক্ষার জন্য। মহন আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَمَا وَهَنُوْا لِمَا اَصَابَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ط وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ـ وَمَا قَوْلَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ »ـ (آل عمران : ١٤٦–١٤٧)

"তারা দমে যায়নি আল্লাহর পথে বিপদাপদ ও কষ্ট যাতনা পেয়ে এবং দুর্বল হয়ে পড়েনি আর হতাশও হয়নি। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। তাদের কথা হলো ঃ হে প্রভূ! আমাদের গুনাহ্ মাফ করে দাও। আমাদের কাজের ক্রটি বিচ্যুতি দূর করে দাও। আর আমাদেরকে দৃঢ় পদ রাখ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে বিজয় দান কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬-১৪৭)

আমার ধারনা যে, ফিলিস্তীনিরা যে আত্মসর্মপণের দিকে ধাবিত হয়েছে তা বেশীদিন স্থায়ী হবে না। থলের বিড়াল বের হয়ে পড়েছে, স্রোত অনেক দূর গড়িয়েছে এবং ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তখন এদের সামনে সর্বশক্তি নিয়ে ইন্তিফাদায় ফিরে আসা ছাড়া আর কোন গত্যান্তর থাকবে না এবং পরিস্থিতি তাদেরকে এজন্য বাধ্য করবে। আর কর্তৃপক্ষকে জনগণের সাথে এসে মিলতেই হবে, তাদের কাতারে শামিল হতেই হবে। তখন সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই কাতারে শত্রুর সামনে দাঁড়াবে,

কবি সত্যিই বলেছেন ঃ

যখন ভাঙ্গা নৌকা ছাড়া চড়ার কিছুই থাকেনা

তখন নিরুপায়ের তাতে চড়া ছাড়া আর কোন পথই থাকে না।

আরবদের ব্যর্থতা

আজকে যে আরবদের দুর্বলতা আমরা দেখছি ও অনুভব করছি তা এমন পর্যায়ে নয় যে, যেখান থেকে বের হয়ে আসা যাবে না। এটা অবশ্যই এক অস্বাভাবিক অবস্থা এবং তা অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ হলো আরব রাষ্ট্রগুলোর মাঝে বিভক্তি। এই বিভক্তির শুরু যখন থেকে ক্যাম্পডেভিড চুক্তির আওয়াজ উঠে এবং উম্মতে

ইসলামীর যুদ্ধ থেকে মিসর নিজেকে সরিয়ে নেয়। অথচ এই মিসরই ফিলিস্তীন তথা কুদস-এর জন্য জান ও মাল কুরবানী দিয়েছে। এর জন্য একাধিক জিহাদে শরীক হয়েছে।

এই বিভক্তি আরো বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যা আরবদেরকে ভেঙ্গে তছনছ করে দেয় এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়। এতে তারা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তারা ধনী রাষ্ট্রগুলোর কাছে ঋণী হয়ে পড়ে। আর অনেকেই তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। এটা ছিল এক বড় ধরনের আঘাত। এতে লাভবান হয়েছে ইসরাইল, আমেরিকা ও তার দোসররা। তারা আমাদের মাটিতে তাদের পুরাতন অস্ত্র নিঃশেষ করেছে এবং আমাদের জাতির ওপর নতুন অস্ত্রের পরখ করেছে। আমাদের টাকা পয়সায় আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছে। আমাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেছে। আমাদের হাত দিয়েই আমাদের দালান-কোঠা, ঘর-বাড়ি ধ্বংস করিয়েছে, যেন আবার আমাদের টাকা পয়সা দিয়েই তা মেরামত করে দেয়, তৈরী করে দেয়।

এ বিষয়টিতে আরব বিশ্ব এমনভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে যা আর কোনো বিষয়ে এরূপ বিভক্ত হয় পড়েনি। কেননা বিষয়টি ছিল খুবই স্পর্শকাতর ও জটিল এবং বিদেশী হস্তক্ষেপ। যে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করল সে যেন কুয়েতে ইরাকি আগ্রাসনকেই সমর্থন করল। আর যারা আমেরিকা ও পশ্চিমা সামরিক হস্তক্ষেপকে সমর্থন করল কুয়েত মুক্ত করার জন্য, তারা প্রকারান্তরে ইরাককে ধ্বংস করতে সমর্থন করল এবং এ অঞ্চলে বিদেশী আগ্রাসনকে সাহায্য করল।

আর তৃতীয় মধ্যম মতটি হারিয়ে গেল, যা আগ্রাসনকে নিন্দা করে এবং সৈন্য প্রত্যাহার দাবি করে এবং এ অঞ্চলে ব্যাপক বিদেশী হস্তক্ষেপ ও উপস্থিতির বিরোধিতা করে। এরা সর্বক্ষেত্রেই সমান দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, যেমনটি মিসরসহ বিভিন্ন দেশের কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ ভূমিকা রাখেন। এরা প্রসিদ্ধ আল-আল-আহরামের পাতায় এ ব্যাপারে বক্তব্য ও বিবৃতি এবং লেখা ছাপেন (এদের মধ্যে অন্যতম হলেন উস্তাদ ফাহমী হুআয়দী)।

মোটকথা হলো সেই ধিকৃত দিনটি থেকেই আরব বিশ্বের প্রাচীরে ফাটল ধরে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যে এ ফাটল সারাবে। যদিও বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানী-গুণীজন আহবান জানিয়েছেন এই সংকট থেকে

উত্তরণের জন্য। এটা কোনো ক্রমেই আমাদের উপর যুগ যুগ ধরে চেপে বসে থাকা উচিত নয়। আমাদের দ্বীন, জাতীয় স্বার্থ এবং আমাদের নৈতিকতার দাবিই হলো এই সংকট থেকে বের হয়ে আসা। কেননা এর ওপর আমাদের বাঁচা-মরা তথা অস্তিত্বের প্রশ্ন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে অনেকেভাবতে পারেন আজ বিশ্বে কোন ক্ষুদ্র শক্তি বা জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। এজন্য দেখা যাচ্ছে যে, যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিকভাবে বিচ্ছিন্ন থেকেও আজ বৃহত্তর ঐক্য ও স্বার্থে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী এক হচ্ছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আমরা কিছু শুভ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি যেমন আরব বিশ্ব ইরাকে আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সর্বসম্মতভাবে প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়েছে। আরবদের আমেরিকার বিরুদ্ধে এই অবস্থান প্রমাণ করে যে, এই উম্মত এখনও মরে যায়নি এবং ভবিষ্যতেও মরবে না।

ইসলামী দেশগুলোর ব্যর্থতা

আরবীয় ব্যর্থতা যেমন সাময়িক; তেমনিভাবে ইসলামী দেশগুলোর ব্যর্থতাও সাময়িক বলে আমরা মনে করি। আমরা মনে করি যে, সুস্থ শরীরকে যেমন রোগ ব্যাধিতে আক্রমণ করে, এর চিকিৎসা হলে যেমন তা সেরে যায়, তেমনি মুসলিম বিশ্বের ব্যর্থতাও একদিন দূর হয়ে যাবে। আমাদের উম্মতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা, রোগ-বালাই চেপে বসেছিল। শত্রুরা মনে করেছিল যে, এবারই একে খতম করে দিবে। এ থেকে মুসলিম বিশ্ব আর রেহাই পাবে না। কিন্তু উম্মত তা থেকে বের হয়ে এসেছে যেমন স্বর্ণকে আগুনে পোড়ানোর পর তা আরো নিখুঁত ও চকচকে হয়ে বের হয়ে আসে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি পশ্চিমাদের ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) এবং প্রাচ্যে তাতারদের আক্রমণ উম্মতের দুর্বলতার সময়, যখন তারা নিজেদের ভিতরে অনৈক্যে জড়িয়ে পড়ে এবং শাসকরা হয়ে পড়ে আত্মমগ্ন। এমনকি প্রথম বারের মত তাদের প্রধান ঘাটি, রাজধানীর পতন ঘটে এবং তাদের উপর শত্রুরা শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেশকে ভাগ করে নেয়। আর মসজিদুল আকসা পুরো নব্বই বছর পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের হাতে বন্দী হয়ে থাকে।

এরপর মহান আল্লাহ এমন সব যোদ্ধাদের একাজে এগিয়ে আসার তাওফীক দান করেন যারা আরব বংশভূত ছিলনা কিন্তু ইসলামই তাদেরকে আরবী বানিয়ে দিয়ে ছিল। এদের মধ্যে তুর্কী যেমন এমাদুদ্দীন জংগী এবং তাঁর পুত্র নুরুদ্দীন

মাহমুদ, কুর্দী যেমন সালাহুদ্দীন আইউবী এবং অন্যান্যরা যেমন সাইফুদ্দীন কতুজ, জাহির বারবেস মামলুক বংশদ্ভূত।

শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডাররা লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর তাতাররা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করে।

বর্তমান যুগে পশ্চিমা উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলে। পূর্বের ইন্দোনেশিয়া থেকে পশ্চিমের মরোক্কো পর্যন্ত সব দেশ দখল করে নেয়। তাদের জেনারেল, রাজনীতিবিদ এবং মিশনারীরা মনে করে যে, এসব দেশ তাদের জন্য চিরদিনের মত হয়ে গেছে। এমনকি এদের কেউ কেউ এসবকে নিজেদের দেশেরই একটা অংশ বলে মনে করতে শুরু করেছিল যেমন আলজিরিয়াকে। এরপর ইসলামই আবার উম্মতকে তার ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে, তাদের বন্ধ্যাত্ব থেকে নাড়িয়ে তুলে, তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে, যার ফলে প্রতিটি দেশেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। দ্বীন ইসলামই ছিল তাদেরকে জাগাবার মূলমন্ত্র। শেষ পর্যন্ত এক চূড়ান্ত যুদ্ধ হয় আলজিরিয়াতে। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত চলে এ যুদ্ধ। অতপর ১৯৬১ সালে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়। আমাদের প্রিয় নবী, মানবতার শিক্ষক, হযরত মুহাম্মদ (সা.) উম্মত যে দুর্বলতায় আক্রান্ত হবে সে সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং এর কারণ যা বর্ণনা করেছেন তা হল চারিত্রিক দুর্বলতা। হযরত সাওবান (রা.) হতে আহমাদ ও আবু দাউদে বর্ণিত হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"আশংকা করা হচ্ছে যে, অচিরেই তোমাদের উপর চারদিক থেকে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ঝাঁপিয়ে পড়বে যেমন খাবার গ্রহণের জন্য লোকজন দস্তরখানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা বললেন, তখন আমরা কম থাকবো বলে হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ বরং তোমরা তখন অনেক থাকবে কিন্তু তোমরা হবে সমুদ্রের ফেনারাশির মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তকরণ থেকে তোমাদের ভয় কেড়ে নিবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা নিক্ষেপ করবেন। তারা বললেন, কিসের দুর্বলতা হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ দুনিয়া প্রীতি ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা।"

দুনিয়ার প্রতি মহব্বত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করাই হলো দুর্বলতার গোপন কারণ। উম্মত যদি নিজেকে পরিবর্তন করে নেয় এবং দুনিয়া যদি তার মূল

উদ্দেশ্য না হয়ে যায়, তাহলেই মহান আল্লাহ অবস্থার পরিবর্তন করে দিবেন। যখন তারা কোন ভ্রুক্ষেপই করবে না যে, মরণ তার উপর এসে পড়ল, না সেই মরণের উপর ঝাঁপ দিল, তখন আল্লাহ দুর্বলতাকে শক্তিতে, জিল্লতীকে মর্যাদায় এবং পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করে দিবেন।

বর্তমানে ইসলামী জাগরণের মাধ্যমে সমাজকে জ্ঞান দ্বারা নতুন করা হয়েছে অন্তকরণকে ঈমান দ্বারা যার প্রভাব উম্মতের যুবকদের উপর লক্ষ্য করা যায়, পুরুষ মহিলা সবার উপর যেন জমির উপর মেঘ বর্ষিত হয়েছে। পানি পেয়ে মনে হচ্ছে শস্যশ্যামলায় ভরে উঠছে।

ইসলামী উম্মত প্রকৃতপক্ষে শক্তি, উন্নতি, অগ্রগতি এবং নেতৃত্বের মৌল সম্পদের অধিকারী মানব সম্পদের অধিকারী (১৩৩ কোটি মানুষ) এবং জৈবিক সম্পদের- পাহাড় পর্বত খনি সমুদ্র নদ-নদী ... ইত্যাদির অধিকারী এবং সভ্যতার অধিকারী বিভিন্ন মহাদেশের মিলন কেন্দ্রে অবস্থিত এই উম্মতের দেশেই ফেরাউনী, ফিনিকীয়, আশুরিয়, ব্যাবিলন, ফার্সী সভ্যতার জন্ম। এছাড়া রয়েছে ইসলামী সভ্যতা আর এ ভূমিতেই জন্মেছে বড় বড় আসমানী কিতাবের সভ্যতা, যেমন, ইহুদী, খৃষ্টান এবং ইসলামী সভ্যতা। এছাড়াও রয়েছে বিরাট আত্মিক সম্পদ যা এই উম্মতকে অন্যান্য জাতি সত্তা থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে। এ উম্মতই একমাত্র ক্ষমতা রাখে ভারসাম্যের এবং সবকিছুকে ব্যাপ্ত করার সেটি হল ইসলামী রেসালাত। এই উম্মতের অনেক জাতিই বিভিন্ন প্রান্তে আজ পশ্চাদপতার জাল ছিন্ন করে এগিয়ে আসছে, যে পশ্চাদপতায় ডুবে ছিল যুগ যুগ ধরে। আজ চলে গেলে কাল আসবেই আর আগামী কাল অবশ্যই আসবে সুন্দর ও সাবলীল হয়ে।

আমেরিকার একক মোড়লী

আমেরিকা আজ গোটা বিশ্বে একক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছে। সে মোড়ল সেজে বিশ্ব রাজনীতিকে তার ইচ্ছা ও স্বার্থ মোতাবেক পরিচালিত করছে। জাতিসংঘ ও তার পার্শ্ব সংগঠনগুলো তার ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছে। কেউ এর বিরোধিতা বা বিদ্রোহ করতে পারছে না। যদি কেউ করে তাহলে তার উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শাস্তি নেমে আসছে। এমন কি সাময়িক শাস্তিও। আমাদের মনে হতে পারে এই মোড়লী মানবতার উপর চিরদিনের জন্য চেপে বসেছে আসলে তা নয়। তার ইচ্ছে মত তা ন্যায় বা

অন্যায় হোক বাধ্য হয়েই হোক বা অবাধ্য হয়েই হোক এমনটি নয় বরং এটা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিরই সৃষ্টি যা অবশ্যই পরিবর্তনশীল।

মহান আল্লাহর নিয়ম-পদ্ধতি হল ঃ শক্তিশালী চিরদিন শক্তিশালী থাকবে না। দুর্বল যুগ যুগ ধরে দুর্বল থাকবে না। আমরা কত শক্তিশালীকে দুর্বল হতে দেখলাম। দেখলাম কত দুর্বল আবার শক্তিশালী হয়ে গেছে। কত সম্মানিত হয়েছে লাঞ্ছিত, আবার কত অপমানিত হয়েছে সম্মানিত। ইতিহাসের পাতায় এর অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। আমাদের জীবনেও এ ধরনের অনেক ঘটনা প্রবাহ রয়েছে যা কারো নিকট অস্পষ্ট নয়। মহান আল্লাহর এটা সুবিচার যে, তিনি কোন একক শক্তিকে তার সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব করতে দেন না। যে তাদের উপর কর্তৃত্ব চাপিয়ে রাখবে ভয়-ভীতির দ্বারা। বরং আল্লাহর নিয়ম হল মানুষের মাঝে উত্থান পতন। এর উদ্দেশ্য একের দ্বারা অন্যের জুলুম প্রতিহত করা।

একের দ্বারা অন্যের মন্দকে দূর করেন নতুবা স্বৈরাচার ও একনায়করা সকলকে ধ্বংস করে দিত। তাদেরকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করত। মহান আল্লাহ বলেন,

«وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ»۔ (البقرة : ٢٥١)

"যদি আল্লাহ কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের পিছনে লাগিয়ে না দিতেন তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হত। কিন্তু আল্লাহ হলেন বিশ্ববাসীর জন্য দয়াবান।" (সূরা বাকারা ঃ ২৫১)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

«وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا»۔ (الحج : ٤٠)

"আল্লাহ যদি মানুষের কিছু লোককে অন্যদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে না দিতেন তাহলে গীর্জা, প্যাগোডা, উপাসনালয় এবং মসজিদকে ধ্বংস করে ফেলা হত যাতে আল্লাহর নাম অসংখ্যবার স্মরণ করা হয়ে থাকে।" (সূরা হজ্ব ঃ ৪০)

এই নিয়মের আলোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদিত করেছিল আমেরিকার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব রুখার উদ্দেশ্যে (ইউরোপীয় পুঁজিবাদী আগ্রাসান) এর ফলে অনেকটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এর দ্বারা দুর্বল

রাষ্ট্রগুলি উপকৃত হয়েছিল। যদিও পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র সবই অন্যায় ও মিথ্য কিন্তু আল্লাহ্ জালেম দ্বারাই আরেক জালেমকে প্রতিহত করে থাকেন। কবি সত্যিই বলেছেন,

যত হাতই থাক না কেন তার উপরে রয়েছে আল্লাহর হাত

তিনি জালেমকে দিয়েই জালেমকে করেন কুপোকাত।

এজন্যই আগের যুগের মুসলমানেরা দু'আ করতেন এই বলে, হে আল্লাহ জালেমকে জালেম দ্বারা ব্যস্ত রেখ এবং আমাদেরকে তাদের মধ্য থেকে নিরাপদে বের করে নিয়ে এসো।

প্রবাদ আছে, যদি বিড়াল আর ইদুরে সমঝোতা হয়ে যায় তাহলে মুদীর দোকান নষ্ট হয়ে যাবেই।

শক্তিশালীদের মতপার্থক্যের ফলে দুর্বল মানবতার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। তাই তারা যেন স্বার্থের ব্যাপারে একমত না হতে পারে। কেননা তাদের ঐক্য হওয়া হল গজব, আর অনৈক্য হল রহমত। তেমনি তাদের কেউ একজন একক শক্তির অধিকারী হওয়া এবং তার বিরুদ্ধবাদী থেকে মাঠ খালি হওয়া দুর্বলদের স্বার্থের অনুকুল নয়।

এই নিয়মের দাবী অনুযায়ী অবশ্যই নতুন শক্তি বা জোটের আবির্ভাব ঘটতে হবে যা আমেরিকার সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবে, তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসবে যেন সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে। এর কিছু আলামত দেখা যাচ্ছে যেমন সর্বশেষ রুশ-চীন চুক্তি যা নতুন শক্তির উত্থানের ইঙ্গিত বহন করছে। যদিও এখন এদের কাছে এমন মাল-মসলা নেই যা দ্বারা আমেরিকাকে মোকবিলা করবে। কিন্তু নিদেনপক্ষে একটা জোট তো হতে যাচ্ছে বিরাট সামরিক ও মানব সম্পদের অধিকারী আমেরিকার এবং তার উন্নতর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবকাঠামোর মোকাবিলায় যা তার হাতে রয়েছে।

আমেরিকার মোড়লী যেহেতু চিরদিন থাকবে না, তেমনি আমেরিকার পক্ষপাতহীন অন্ধ সমর্থন যা ইসরাইলকে দিয়ে যাচ্ছে, যা একাধারে অমানবিক বর্বর এবং কোন ক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়, আমাদের ধারনা আমেরিকার জনগণ

একদিন এই লাগাতার ইসরাইলী প্রচারনা যা ইহুদী লবী নিয়ন্ত্রণ করছে, একদিন এর মুখোশ উন্মোচন হবেই এবং সত্য প্রকাশ হয়ে পড়বে সেদিন এই জালেমদের পক্ষে কেউ থাকবে না এবং সকলে মজলুমদের পক্ষে অবস্থান নিবে, চোরের দশ দিন গৃহস্থের একদিন, একথা ভুললে চলবে না।

বিশ্ব অনুপুস্থিতি

বিশ্ব অনুপুস্থিতির ব্যাপারেও বলা যায় যে এটিও আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্যের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু সে সবার উপর তার তরবারী ঘুরাচ্ছে এবং এমন একজন শক্তিশালী নেতা নেই যে আমেরিকার মুখের ওপর হক কথা বলবে এবং জালেমের জুলুমকে ভয় পাবে না। আজ গোটা বিশ্ব একটি গ্রামের মত হয়ে গেছে, যার মোড়ল হল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, আমেকিার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তার চৌকিদার এবং আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার ফড়িয়া সেজে বসেছে। এমনকি আজ বিশ্ব রাজনীতিতে ইউরোপেরও তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আমরা দেখছি না। যদিও এদের কেউ কেউ চেষ্টা করছে যেন তার স্বতন্ত্র অবস্থান বজায় থাকে। যেমন ফ্রান্স এ ব্যাপারে উত্তম উদাহরণ।

আর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন- এর না আছে কোন উচু নিশানা আর না আছে কোন জোরালো কণ্ঠস্বর। আজ বিশ্বের জনসংখ্যা ৬০০ কোটির ওপর, তা আজ দাবার গুটির মত হয়ে পড়েছে যাকে চালছে আমেরিকার আঙ্গুল। যেমন ইচ্ছা চালছে, না আছে কোন ভ্রুক্ষেপ, হাতি চাললো না ঘোড়া বরং কোন তোয়াক্কা করে না, না কোন মন্ত্রীর বা কোন বাদশার। সে যাকে ইচ্ছা মারছে, যাকে ইচ্ছা বাঁচিয়ে রাখছে, যতক্ষণ ইচ্ছা রাখছে।

চিরদিনই কি আমেরিকার হাতে বিশ্ব খেলনার বস্তু হয়ে থাকবে? অসম্ভব! আর এই বিশ্ব অনুপস্থিতি কি দীর্ঘদিন ধরে চলতেই থাকবে? আমাদের তা মনে হয় না।

ইসরাঈলের জন্য এই সহায়ক পরিস্থিতি মুসলিমবিশ্ব, আরব, ফিলিস্তিনে এমন পরিস্থিতি চিরদিন থাকবে না। যুগ পরিবর্তনশীল আর পৃথিবীটা হল বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত। একই অবস্থা বর্তমান থাকা অসম্ভব। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেনঃ «وَتِلْكَ الاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ»- (آل عمران : ١٤٠)

"আমরা এই দিনগুলোকে মানুষের মাঝে আবর্তিত করে থাকি।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪০)

অতি সম্প্রতি একটি শুভ সংবাদ এসেছে, তা হলো লকারবীর ঘটনায় আন্তর্জাতিক আদালতের রায় সম্পর্কে । যার সূত্র ধরে আমেরিকা ও বৃটেন লিবিয়ার বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায় ছিল আমেরিকা ও বৃটেনের জন্য চপেটাঘাত এবং লিবিয়ার জন্য বিজয়। এ থেকেই বুঝা যায় যে, থলের বিড়াল বের হয়ে পড়েছে। এই পৃথিবীতে এখনও এমন কিছু স্বাধীন লোক রয়েছেন যাদেরকে কেনাও যায় না এবং তারা কাউকে ভয়ও করে না।

হয়ত কিছু রাজনীতিবিদ আমাদের সমালোচনা করবেন। আমাদেরকে অভিযুক্ত করবেন যে, আমরা ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী চিন্তাবিদ, আমরা কল্পনার রাজ্যে বাস করি। আমরা কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করি, স্বপ্নের রাজ্যে থাকি, বাস্তবতার সাথে কোন মিল নাই। হযরত আলী ইবনে আবী তালেব তার ছেলেকে বলেন, "তুমি কল্পনার উপর ভরসা করিও না, কেননা তা আহম্মকদের সওদা।" কবি বলেন,

তুমি আশার দাস হয়ো না, কেননা

আশা হল কপর্দকহীনদের পুঁজি।

আমরা এদেরকে বলতে চাই, একজন জীবন্ত মানুষ অবশ্যই কল্পনা করবে, স্বপ্ন দেখবে। একজন মানুষের আশা ও হিম্মতের ওপর কল্পনার পরিধি ছোট বা বড় হওয়া নির্ভর করছে।

আমরা কেন স্বপ্ন দেখব না? ইহুদীরাতো আমাদের পূর্বে স্বপ্ন দেখেছিল তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার। তারা আজ তা আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা করেছে। দুনিয়াতে এমন কিছু ছিল না যা থেকে বুঝা যেত যে, একদিন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা এভাবেই জীবন কাটিয়েছে যে, তাদের কালকের স্বপ্ন আজকে বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

আমরা যদি শত্রুর ওপর আমাদের বিজয়ের স্বপ্ন দেখি, আমাদের দেশ পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখি তাহলে অসুবিধা কোথায়? আমাদের আজকের স্বপ্ন কালকে বাস্তবে পরিণত হতে পারে, বিশেষত বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এটাই

বাস্তবতা এবং ইতিহাসের যথার্থতা এবং পৃথিবীতে আল্লাহর নিয়ম-নীতিও আমাদেরকে সমর্থন করছে। আমাদের যেটা ঘাটতি রয়েছে তা হলো বজ্র কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের, হতাশা থেকে আশার পথে ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং দুর্বলতা ঝেড়ে কঠিন পাথরের মত রুখে দাঁড়াবার। আর হুংকার দিয়ে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তোলার : না, না, না।

আমরা যদি একজোট হয়ে বজ্রকণ্ঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করতে পারি তাহলে শত্রুর হৃদয়ে কম্পন শুরু হবে। এরপরে তাই ঘটবে যা আমরা চাই। আমরা আমাদের দুর্বল আত্মার উপর বিজয়ী হবো এবং আল্লাহর প্রতি আমাদের দৃঢ় আস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারবো এবং মহান আল্লাহর এ ডাকে সাড়া দিতে পারবো :

«فَلاَ تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ» (محمد : ٣٥)

"তোমরা হতোদ্যম হয়ে পড়ো না এবং (গায়ে পড়ে) সন্ধির দিকে এগিয়ে যেয়ো না। শেষ পর্যন্ত তোমরাই বিজয়ী হবে। আল্লাহ তোমাদের সাথেই আছেন। তিনি কখনোই তোমাদের কর্মফলকে বিনষ্ট করবেন না।" (সূরা মুহাম্মদ : ৩৫)

আমাদের ও ইসরাঈলের মধ্যে যুদ্ধের মূল কারণ

আমরা এখানে একটি বিষয় পরিস্কার করে তুলে ধরতে চাই যা অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে। যাদের অনেকেই ইসরাইলী প্রোপাগান্ডার শিকার হচ্ছেন। বিষয়টি হলো আমাদের ও ইসরাঈলের মধ্যে যুদ্ধের কারণ এবং এর প্রকৃতি। কী কারণেএই দুই জনের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল ১৯৪৮ সালে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও আর্গে এবং এরপর আজকের দিন পর্যন্ত?

আমরা ইসরাইলীদের শত্রুতা করছি তারা সামীয় হওয়ার কারণে?

এই দুইজনের মধ্যে শত্রুতা ও যুদ্ধের কারণ কি যে, সেটি সামীয় রাষ্ট্র? উত্তর হলো এটি কোনো মুসলমানের কল্পনায় আসতে পারে না দুটি মৌলিক কারণে: এক. আমরা আরবরাই সামীয় এবং আমরা বনী ইসরাঈলদের চাচাত ভাই। যদি তারা হয় ইসরাইল অর্থাৎ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের (আ.) বংশধর, তাহলে আমরা ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের (আ.) বংশধর।

ইসরাইলীরা এ ব্যাপারে আমাদের বেশি কিছু বলতে পারবে না এবং আমাদের অভিযুক্তও করতে পারবে না। বলতে পারবে না আমরা সামীয়দের শত্রু, যা দিয়ে সে পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্যবসা করছে এবং যে কেউ তার এই নীতির বিরোধিতা করছে বা যে তার এই অনৈতিক ও বিদ্বেষমূলক নীতির সমালোচনা করছে তার সামনেই তরবারী উঁচিয়ে ধরছে। বরং কুরআন সকল মুসলমানকেই ইবরাহীমের বংশধর বলে সাব্যস্ত করেছে।

«هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ»۔ (الحج : ٧٨)

"তিনিই তোমাদের চয়ন করেছেন এবং তোমাদের জন্য দ্বীনের মাঝে কোনো সমস্যা রাখেন নি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের জীবনব্যবস্থা।" (সূরা হজ্ব : ৭৮)

দ্বিতীয়ত. মুসলামানরা বিশ্বাসগত (আকীদাগত) ও মানসিকভাবে বিশ্বজনীন গুণাবলীর অধিকারী এবং তারা কোনো জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধবাদী নয়। তারা একই পরিবারভুক্তের মতো, যাদের আল্লাহর দাসত্ব একত্রিত করেছে এবং আদমের সন্তান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন,

«يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ»۔ (الحجرات : ١٣)

"হে মানব জাতি, আমরা তোমাদেরকে এক পুরুষ এবং এক মহিলা থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খোদাভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাতা, সব কিছুর খবর রাখেন।" (সূরা হুজুরাত : ১৩)

নবী করীম (সা.) বলেন, "হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভু হলেন একজন এবং তোমাদের পিতাও একজন। তোমরা সকলেই আদম হতে এবং আদম হলেন মাটির তৈরি।" (আহমাদ) আজকের সব ইহুদীও সামীয় নয় যেমনটি তারা ধারণা করছে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর প্রবেশ ঘটেছে, যেমন, খাজর গোত্রের ইহুদীরা, সালাসা ইত্যাদি। কেননা ইহুদী একটি ধর্ম, এটা কোনো জাতীয়তাবাদ নয়।

আমরা ইসরাইলের বিরোধিতা করছি ইহুদীবাদের কারণে ?

সামীয় হওয়াটা যেমন আমাদের এবং ইসরাইলের মাঝে শত্রুতা ও দ্বন্দ্বের কারণ নয়, তেমনি এটি একটি ধর্ম তাও দ্বন্দ্বের কারণ নয়। ইহুদী ধর্ম মুসলমানদের দৃষ্টিতে একটি ঐশী ও আসমানী ধর্ম। এই ধর্ম হযরত মুসার (আ.) দ্বীন যাকে আল্লাহ্ তাঁর রেসালাত এবং সরাসরি কথা বলার জন্য চয়ন করেছিলেন। তাঁর ওপর তাওরাত নাজিল করেছিলেন যাতে ছিল মানবতার জন্য হেদায়াত ও আলো এবং তিনি একজন বিশিষ্ট রাসূলদের অন্তর্গত। আমরা কুরআনে এব্যাপারে পড়ে দেখতে পারি,

«قَالَ يٰمُوْسٰى إِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ ز فَخُذْ مَا أٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ ـ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى

الاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ ج فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ».(الاعراف : ١٤٤-١٤٥)

"তিনি বললেন, হে মুসা! আমি তোমাকে মানুষের মাঝে নির্বাচিত করেছি আমার রেসালাতের জন্য এবং আমার কথনের জন্য। সুতরাং তোমাকে যা আমি দিয়েছি তা গ্রহণ কর এবং তুমি কৃতজ্ঞতা কারীদের অন্তর্গত হয়ে যাও। আমি তাকে যে কিতাব প্রদান কির তাতে রয়েছে সবকিছুর সৎউপদেশ এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। সুতরাং একে শক্তি দিয়ে ধর এবং তোমার জাতিকে নির্দেশ দাও যেন তারা একে উত্তমভাবে গ্রহণ করে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৪-১৪৫)

কুরআন মজীদে ইহুদী খৃষ্টানদের জন্য একটি উপাধি নির্বারণ করা হয়েছে। তাদেরকে 'আহলে কিতাব' বা 'কিতাবওয়ালা' সম্বোধন করে খুব আপন করে ডাকা হয়েছে। তাদেরকে আহবান করা হয়েছে হে আহলে কিতাব অর্থ হল তাওরাত ও ইঞ্জিনের অনুসারীরা, তারা আসমানী দ্বীনের অনুসারী। যদিও তারা এতে পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করেছে।

ইহুদীরা খৃষ্টানদের থেকে ইবরাহীমের দ্বীনের অতি নিকটবর্তী

ইহুদীরা খৃষ্টানদের থেকে ইবরাহীমের দ্বীনের বেশী কাছে। বরং আমি আরেকটু এগিয়ে বলি, অনেক বিষয়েই ইহুদীরা ধর্মীয় দিক থেকে খৃষ্টানদের চেয়ে মুসলামানদের খুবই কাছে। কেননা তারা ইবরাহীমের দ্বীনের দিকে নিকটবর্তী তা শরীয়তগতই হোক বা আকীদাগত (বিশ্বাসগত) দিক থেকে। খৃষ্টানরা তাদের দ্বীনের মৌলিক বিষয়কে পরিবর্তন এবং একে বিভিন্ন বিভক্তিতে বিভাজন করে ফেলেছে। পক্ষান্তরে ইহুদীরা এসবের অনেক কিছুকেই সংরক্ষণ করে রেখেছে যা তারা তাদের পিতা ইবরাহীম (আ.) থেকে পৈতৃক সূত্রে পেয়েছে।

যেমন ইহুদীরা খৃষ্টানদের মত ত্রিত্ববাদের কথা বলে না, তেমনি তারা মুসাকে প্রভূ বলেও মানে না যেমন খৃষ্টানরা ঈসাকে প্রভূ বলে থাকে।

যদিও ইহুদীরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে ফেলেছে যেমনটি খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যারাই তাওরাতের ভ্রমন কথা (আসফার) এবং ইলাহ সম্পর্কে অধ্যয়ন করবে।

ইহুদীরা যা কিছু বিশ্বাস করে ইলাহ এবং নবুওয়াত সম্পর্কে খৃস্টানরাও তা-ই বিশ্বাস করে। কেননা তাওরাত ও এর পরিশিষ্ট গুলো (পবিত্র গ্রন্থ) যা রয়েছে (ইহুদী-সংস্করণ)। তারা ইহুদীদের চেয়ে অতিরিক্ত যেটা করেছে সেটা হল ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস এবং ঈসাকে প্রভূ বলে বিশ্বাস করা।

ইহুদীরা মুসলমানদের মতই খাতনা করে থাকে, কিন্তু খৃষ্টানরা খাতনা করে না।

ইহুদীরা জীব জন্তু ও পাখি হালাল হবার জন্য যবেহ করাকে শর্ত বলে গণ্য করে যেমনটি মুসলমানেরা করে থাকে কিন্তু খ্রীষ্টানরা যবেহ করে না। কেননা তাদের ধর্মগুরু পোলিস বলেছেন, যা কিছু পবিত্র তা পবি লোকদের জন্যই।

ইহুদীরা শুকরকে হারাম বলে গণ্য করে যেমন মুসলমানেরা করে থাকে, কিন্তু খ্রীষ্টানরা একে হালাল বলে গণ্য করে। ইহুদীরা ফেরেশতা, নবী ও সৎলোকদের মূর্তি তৈরী করাকে হারাম মনে করে থাকে, যেমন মুসলামানেরা হারাম মনে করে। কিন্তু খৃষ্টানরা তা হারাম মনে করে না। এজন্যই তাদের গীর্জা, উপাসনালয়গুলো বিভিন্ন রঙ এবং সাইজের মূর্তিতে ভরা।

আমরা যদি ইহুদীদের সাথে বিশ্বাসগত কারণেই যুদ্ধ করতাম, তাহলে খৃষ্টানদের সাথেও করতে হত।

এর দ্বারাই স্পষ্টভাবে ভুলটি ফুটে উঠে যে, কিছু লোক বিশেষ করে ধর্মপ্রাণ লোক মনে করে যে, আমরা তাদের সাথে বিশ্বাসগত কারণে যুদ্ধ করছি। এর অর্থ হল আমরা ইহুদীদের সাথে লড়াই করছি কেননা তারা মুহাম্মদের রিসালাতকে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ বাণীকে বিকৃত করেছে এবং তাদের কিতাবে প্রভূত্বকে বিকৃত এবং কর্দয করেছে। তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে তুলনা করেছে যেমন তাদের পরে খৃষ্টানরা সৃষ্টিকে স্রষ্টার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে এবং নবী রাসূলদের চরিত্রকে কালিমাযুক্ত করেছে এবং আরো যে সব অপকর্ম করেছে যা কুরআন বিবৃত করেছে- নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা এবং আল্লাহর উপরে অনধিকার করা যেমন তারা বলে, আল্লাহর হাত আবদ্ধ, তারা বলে আল্লাহ দরিদ্র আর আমরা ধনী, এ দৃষ্টিভঙ্গি যা অনেকের মনে উদিত হয়ে থাকে সম্পূর্ণ ভুল। আমরা দেখেছি যে, ইসলাম ইহুদীদেরকে আহলে কিতাব বলে গণ্য করেছে। তাদের খাবার হালাল বলে সাবস্ত্য করেছে এবং তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করাও জায়েয করেছে। তারা কয়েকশ বছর মুসলমানদের

মাঝে বসবাস করেছে। বিশ্ববাসী তাদেরকে বিতাড়িত করেছে। তাদেরকে খেজুরের বিচির মত ছুড়ে ফেলেছে স্পেন ও অন্যান্য দেশ থেকে। তারা মুসলিম দেশ ছাড়া আর কোথাও একটু সামান্যতম সহানুভূতিও পায়নি। মুসলমানেরা চিন্তাও করেনি যে, তারা একদিন ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ-লড়াই করবে।

বরং অনেক মুসলিম দেশে তারা ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও শাসক বর্গের খুব নৈকট্য লাভ করে যারফলে অনেক মুসলমানই তাদেরকে ঈর্ষা করতে শুরু করে। যেমন মিসরের বিখ্যাত কবি হাসান বিন খাকান বিদ্রুপ করে বলেন,

বর্তমানে ইহুদীরা পৌছেছে তাদের কাঙ্খিত স্থানে
এবং পেয়েছে মান সম্মান, তাদের কাছে রয়েছে ধনদৌলত
তারা হয়েছে বাদশার পরামর্শক।
হে মিসরবাসী! আমি তোমাদেরকে উপদেশ দেই
তোমারা ইহুদী হয়ে যাও
গোটা দুনিয়া আজ ইহুদী হয়ে গেছে।

ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে ইহুদীদের ঘৃণ্য অবস্থান

অনেক মুসলমানই হয়ত মনে করেন যে, ইহুদীরা খৃষ্টানদের চেয়েও আকিদাগত (বিশ্বাসগত) ভাবে খারাপ। ইহুদীরা ইসলামী দাওয়াতের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব পোষণ করে। ইসলামের নবীর ব্যাপারে ঘৃণ্য অবস্থান গ্রহণ করেছিল যেমনটি আমরা মদীনার ইহুদী বনী কাইনুকা, বনী নজীর এবং বনী কুরায়জার অবস্থা থেকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

সে অবস্থানটি ছিল খুবই খারাপ এবং নতুন দ্বীনের ব্যাপারে, নতুন নবীর ব্যাপারে এক জঘন্য ও শত্রুতামূলক অবস্থান। অথচ তারা এক নবীর আগমনের শুভ সংবাদ দিত। খুব শীঘ্রই যাঁর আবির্ভাব ঘটবে। তারা তাদের প্রতিবেশী আরব- আউস ও খাজরাজদের হুমকি দিত এই বলে যে তারা তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং তাঁর সাথে যোগ দিবে। তারা তাদেরকে আদ ও এরাম সম্প্রদায়ের মত হত্যা করবে। তারা ধারনা করেছিল যে, নবী হবেন ইসরাইলের (ইয়াকুবের) বংশধর থেকে। কিন্তু যখন দেখল ইসমাঈলের বংশধর থেকে নবী হয়েছে তখন তারা হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী ঈমান হয়ে আনেনি। এ বিষয়টি

মহান আল্লাহর এ বাণীতে লক্ষ্য করা যায়,

«وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ - بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ج فَبَاءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ»- (البقرة : ٨٩-٩١)

“যখন তাদরে নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব আসলো যার যথাযথ প্রমাণ তাদের নিকট রয়েছে। তারা ইতোপূর্বে কাফেরদের উপর বিজয়ী হবার স্বপ্ন দেখতো। কিন্তু যখন তাদের নিকট নবী আসলো তারা চিনতে পারল। তখন তাঁর সাথে কুফরী করল সুতরাং কাফেরদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা নিজেরা যা ক্রয় করল তা খুবই খারাপ। আল্লাহ যা নাযিল করছেন তারা তা অস্বীকার করল অবাধ্যতা করে। আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করে থাকেন। সুতরাং তারা ক্রোধের দিকে ফিরে গেল। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি। যখন তাদেরকে বলা হল আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার ওপর ঈমান আনো। তারা বলল, আমাদের ওপর যা নাজিল হয়েছে তার ওপর ঈমান আনবো এবং তারা এর বাইরে যা আছে তার ওপর কুফরী করল অথচ তা সঠিক এবং তাদের নিকট যা রয়েছে তার সত্যায়নকারী।” (সূরা বাকারা ঃ ৮৯-৯১)

মুহাম্মদের রিসালাতের সাথে তাদের কুফরী সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পর পরই তাদের সাথে চুক্তি করেছিলেন। তাদের সাথে সহাবস্থান এবং একে অপরকে সাহায্য করার জন্য এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তাদের সাথে ঐতিহাসিক চুক্তি করেন যা আজও মদীনার সনদ নামে খ্যাত, যাকে অনেকেই বিশ্বের প্রথম সংবিধান বলে গণ্য করে থাকেন যাতে তাদের এবং

মুসলমানদের মাঝে সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছিল। সে সনদে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্কও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু খুব দ্রুত তাদের ওপর তাদের প্রকৃতি বিজয়ী হয়। তারা চুক্তি ভঙ্গ করে, সীমা লঙ্ঘন করে। তারা রাসূল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং পৌত্তলিকদের সাথে মিলে রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। এমনকি বনী কুরায়জা মদীনা আক্রমনকারী মুশরিকদের সাথে জোট গঠন করে, যারা মুসলমানদেরকে নির্মূল করতে এসেছিল। তারা চেয়েছিল মুসলমানদেরকে একেবারে শেষ করে দিতে। এর ফলে অবশ্যই দু'দলের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে। যার ফলশ্রুতিতে বনী কাইনুকা ও বনী নজীরকে বিতাড়ন করা হয় এবং বনী কুরায়জার যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হয় এবং খয়বার বাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়।

সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মায়েদা, সূরা হাশর ও অন্যান্য সূরায় আয়াত নাজিল হয় যাতে ইহুদীদের এই অবস্থানের নিন্দা করা হয় এবং মুসলমানদের সাথে তাদের এই কঠিন শত্রুতার কথাটি উল্লেখ করা হয়। যেমনটি মহান আল্লাহর এ বাণীতে দেখা যায়,

« لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا »

"আপনি পাবেন ঈমানদারদের সাথে চরম শত্রুতাকারী হিসেবে ইহুদী এবং মুশরিকদেরকে।" পক্ষান্তরে এ আয়াতেই বলা হয়েছে যে, খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

« وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ». (المائدة : ٨٢)

"আর আপনি ঈমানদারদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদেরকে নিকটে পাবেন যারা বলে আমরা খ্রীষ্টান। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে পাদ্রী ও বৈরাগী এবং তারা অহংকারী নয়।" (সূরা মায়েদা ঃ ৮২)

এজন্যই দেখা যায় ইহুদীদের মধ্যে যারা ইসলামে প্রবেশ করেছে তারা গুটি কতক মাত্র তাদের অহংকার, কট্টরতা ঔদ্ধতের জন্য এবং এ ধারনার

ফলশ্রুতিতে যে, তারা আল্লাহর পছন্দনীয় জাতি। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানদের কোন কোন জাতি গোষ্ঠী পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করেছে, যেমন সিরিয়া, মিসর, উত্তর আফ্রিকা এবং আনাজোলের অধিবাসী ও অন্যান্যরা।

এরপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র যা ঘটেছে এবং এর প্রভাব মুসলামানদের ওপর কত গভীরভাবে পড়েছে তা ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে।

ইহুদীদের সাথে আমাদের যুদ্ধের মূল কারণ

বাস্তবে আমাদের মাঝে এবং ইহুদীদের মাঝে যুদ্ধ বাধার কারণ হল মাত্র একটি, আর তা হলঃ তারা আমাদের ইসলামের ভূমি জবরদখল করেছে, ফিলিস্তীনের ভূমি এবং আমাদের ভাইদেরকে উচ্ছেদ করেছে। এর আসল অধিবাসীদেরকে বিতাড়িত করেছে এবং তারা তাদের অবস্থানকে লোহা ও আগুন, রক্ত এবং শক্তি দিয়ে ধরে রেখেছে। তারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলেছে কলমের ভাষাকে থামিয়ে দিয়েছে। আমাদের মাঝে এবং তাদের মাঝে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে যতক্ষণ এ কারণও বিদ্যমান থাকবে এবং সন্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাখাত হবে যতক্ষণ তা তারা বলতে থাকবে যে, তারা যা জবরদখল করেছে তাতে তাদের অধিকার রয়েছে। কেননা কেউই ইসলামী ভূমির অধিকার ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখে না। ইসরাঈল ও আমাদের মাঝে সাময়িক চুক্তি হতে পারে, তা স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য। সে সময় নিরাপত্তা বজায় থাকবে এবং একে অপরের সাথে কিছু সম্পর্ক বজায় থাকবে।

কিন্তু ভূমির পরিবর্তে শান্তি এই ধারনা সত্যিই আশ্চর্যজনক। এটা দখলদার জালেম শত্রু চাপিয়ে দিয়েছে, অন্য কেউ নয়। কেননা ভূমি আমাদের, তার নয় যে, সে তা থেকে সরে আসবে শান্তির বিনিময়ে। এমনকি শেষ পর্যন্ত এই ল্যাংড়া-খোঁড়া শান্তিকে ইসরাঈলও প্রত্যাখ্যান করেছে। সে শুধু নিতে চায়, সে কিছুই দিবে না।

যুদ্ধের ধর্মীয় রূপ-প্রকৃতি

এ যুদ্ধের ধর্মীয় দৃষ্টিকোন অস্বীকার করা যায় না, যদিও যুদ্ধ হচ্ছে ভূমির কারণে। তবে এতে অবশ্যই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং ধর্মীয় লক্ষ্য রয়েছে। একজন মুসলমান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হককে রক্ষা করতে বা বাতিলের মোকাবিলা করতে কিংবা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে বা জুলুমের প্রতিরোধে। সুতরাং এটা দ্বীনী

যুদ্ধ, কেননা এটা আল্লাহর পথে যুদ্ধ। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ»۔(النساء : ٧٦)

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে। আর যারা কাফের তারা শয়তানের পথে লড়াই করে।" (সূরা নিসা ঃ ৭৬)

ইসলামের ভূমিকে সুরক্ষা করা মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। ইসলাম এর প্রতিরক্ষা করাকে এবং সবচেয়ে পবিত্র জিহাদ বলে গণ্য করে। তেমনিভাবে যে ব্যক্তি এজন্য নিহত হবে, সে হবে সবচেয়ে মর্যাদাবান শহীদ। নিজ ভূমি প্রতিরক্ষার জিহাদ প্রত্যেক নাগরিকের ওপর ফরজ (ফরজে আইন) যতক্ষণ না তা মুক্ত হয়। যদি সে দেশের জনগণ এজন্য পর্যাপ্ত না হয় তাহলে তার পার্শ্ববর্তী মুসলমানদেরকেও শেষ পর্যন্ত এতে শামিল হতে হবে। ইসলামী শরিয়ত মুসলমানদের জন্য এক বিঘত ইসলামী ভূমি থেকে সরে আসে বা তা ছাড় দেয়া জায়েয করেনি।

ইসলামের ভূমি যদি দু'কিবলার প্রথমটি হয় এবং তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ হয়, তাহলে এর জন্য জিহাদ করা, একে মুক্ত করার জিহাদ হল সবচেয়ে বেশী বড় ফরজ এবং সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং আল্লাহর দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এর জবরদখলকারী যদি আমাদের সাথে লড়াই করে দ্বীনী অনুভূতি নিয়ে দ্বীনি স্বপ্ন নিয়ে, তাহলে আমাদের ওপর ওয়াজিব হল যে আমরাও তাদের মত মন মানসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করব। যদি তারা তাওরাত নিয়ে যুদ্ধ করে, আমরা কুরআনের নির্দেশে জিহাদ করব। তারা যদি তলমুদের শিক্ষার দিকে যায়, আমরা যাব বুখারী-মুসলিমের দিকে। তারা যদি বলে আমরা শনিবারকে সম্মান দিব আমরা বলবো আমরা শুক্রবারকে সম্মান ও মর্যাদা দিবো। তারা যদি বলে (সোলাইমানি) স্তম্ভ, আমরা বলবো আল-আকসা। মোটকথা যদি তারা আমাদের সাথে ইহুদীবাদের পতাকা নিয়ে যুদ্ধ করে, তাহলে আমরা ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবো। যদি তারা মুসার নামে সৈন্য সংগ্রহ করে তাহলে আমরা মুসা, ঈসা এবং মুহাম্মদ (আলাইহিমুস সালাম) এর নামে সৈন্য মজুদ করবো। কেননা আমরা মুসার ব্যাপারে তাদের চেয়ে বেশী হকদার।

জেরুজালেম ও ফিলিস্তীনের ওপর ইহুদীদের দাবী বাতিল

ইহুদী ও যায়নবাদীদের ফিলিস্তীনের ওপর বিরাট দাবী। তারা ধারনা করে যে, আল কুদস এবং সমস্ত ফিলিস্তীনের ওপর তাদের অধিকার রয়েছে। তারা তাদের এই দাবীর ব্যাপারে সোচ্চার, যে দাবীর পিছনে না আছে ধর্মীয় এবং ঐতিহাসিক প্রমাণ। যদিও তারা মিথ্যা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দাবী উপস্থাপন করে থাকে।

কুদস ও ফিলিস্তীনের ওপর ইহুদীদের কোন অধিকার নাই

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এতে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই যে, কুদস হল আরবী ইসলামী যেমন পুরো ফিলিস্তীন আরবী ইসলামী এবং এতে ইহুদীদের কোনই অধিকার নেই যে, সে এগুলো তার অধিবাসীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় এবং একে তাদের রাষ্ট্রের রাজধানী বানায় যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জবরদখল এবং শত্রুতার ওপর ভিত্তি করে।

ইহুদীরা ধারনা করে যে, তাদের ঐতিহাসিক অধিকার রয়েছে এবং ধর্মীয় অধিকার রয়েছে ফিলিস্তীনের ওপর। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে তারা অন্যের ভূমি জবর দখলকারী। এই ভূমির ওপর তাদের সামান্যতম অধিকার নেই, না ঐতিহাসিক দিক থেকে আর না ধর্মীয় দিক থেকে। আমরা এখন এ বিষয়ে আলোচনা করছি ঃ

সাধারণ আলোচনা

ইহুদীদের ফিলিস্তীনে কথিত হকের ব্যাপারে আলোচনা শুরুর পূর্বে তাদেরকে প্রশ্ন করতে চাই ঃ কেন তারা বিগত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দাবী তুলেনি? বরং হার্টঝেল কর্তৃক যায়নবাদের আত্মপ্রকাশের সময় কেন এই দাবী উত্থাপন করেনি? কেননা সকলে একথা জানে যে, তাদের নির্বাচনে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য ফিলিস্তীন ছিলনা। বরং আফ্রিকা ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানকে বিভিন্ন সময়ে নির্বাচিত করেছিল। ফিলিস্তীনকে তাদের কথিত-অঙ্গীকারের ভূমি বলে চিন্তাধারাটি অনেক পরে প্রকাশ পেয়েছে। হার্টঝেল চেষ্টা করেছিল মোজাম্বিকে একখন্ড ভূমি পাবার জন্য এরপর

বেলজিকার কুঙ্গোতে। তেমনি তার বন্ধুরা যায়নদের প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন স্থানকে নির্বাচন করে। মাক্সনোরডো আফ্রিকাকে এবং হাইম ওয়েজম্যান নির্বাচন করে উগান্ডাকে। তেমনি ভাবে ১৮৭৯ সালে আর্জেন্টিনাকে নির্বাচন করে। ১৯০১ সালে এসে নির্বাচন করে সাইপ্রাসকে। ১৯০২ সালে সিনাই অঞ্চলকে, অতপর ১৯০৩ সালে বৃটেন সরকারের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে পুনরায় উগান্ডাকে বাছাই করে। হার্টঝেল মানসিকভাবে অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেননা বিশ্বব্যাপী ইহুদীরা তাদের রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেনি। সেটা আদর্শিক কারণেই হোক বা তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছিল না বলেই হোক। বরং হাখামাতদের যে বিশ্ব সম্মেলন আমেরিকার ফিলাডোলফিয়া শহরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অনুষ্ঠিত হয় তাতে বলা হয়েছে ইহুদীরা যে আধ্যাত্মিক রিসালাত বহন করছে তা পৃথক ইহুদী একক রাজনীতি প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী।

এই অবস্থানের বিপক্ষে হার্টঝেল চিন্তা করে যে, এমন এক চিন্তাধারা প্রবর্তন ঘটাতে হবে যাতে এটাকে ধর্মীয় রূপ দেয়া যায় এবং সাধারণ ইহুদীরা এর ওপর আকৃষ্ট হয় এবং সে মনে করে যে, এজন্য ফিলিস্তীনই হবে একমাত্র নতুন স্থান যা তার এই নতুন আহবানের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ। ফিলিস্তীনে রয়েছে ইহুদীদের পুরাতন সম্পর্ক এবং এতে তাদের রয়েছে ধর্মীয় পবিত্র স্থান। শেষ পর্যন্ত তাদের আবেগের প্রকল্পে ধর্মীয় অনুভূতি প্রাধান্য পায় এবং হার্টঝেলের মৃত্যুর পর তার মত বিজয়ী হয়। হার্টঝেলের মৃত্যুর এক বছর পর ১৯০৫ সালে বিশ্ব ইহুদী সম্মেলনে ফিলিস্তীনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চিন্তাধারাটি গৃহীত হয়।

দাবীর সত্যতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ঐতিহাসিক ভাবে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম কুদসকে প্রতিষ্ঠা করে 'ইয়াবুসীয়' রা। এরা আরবের এক প্রাচীন গোষ্ঠী। এরা কেনানীদের থেকে জাযিরাতুল আরব ত্যাগ করে জেরুজালেমে গিয়ে বসতি গড়ে। এটা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ত্রিশ শতাব্দী পূর্বের ঘটনা। সে সময় এর নাম ছিল 'ওরশালিম' বা 'শালিম' শহর। তাদের প্রথম ব্যক্তির নাম 'ইয়াবুস' হিসেবে পাওয়া যায় এবং তার নামের সাথে কবিলাটির সম্পৃক্ত হয়। তাওরাতে এ নামটির উল্লেখ রয়েছে। এরপর জেরুজালেম ও গোটা ফিলিস্তীন অঞ্চলে কেনানী আরবরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসবাস করে। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.) তার জন্মভূমি ইরাক থেকে এখানে হিজরত করে আসেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী 'সারা' যখন ফিলিস্তীনে

প্রবেশ করেন, তাওরাতের (পুরাতন যুগের আসফারের) ভাষ্যমতে তাঁর বয়স ছিল ৭৫ বছর।

তাঁর বয়স যখন ১০০ বছর তখন ইসহাকের জন্ম হয়। (সাফারুত তাকভীন, ফা ১২) ইবরাহীম ১৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইবরাহীম ফিলিস্তীনে ছিলেন বিদেশী হিসেবে। তিনি সেখানে এক বিঘত জমিরও মালিক ছিলেন না। এমনকি তাঁর স্ত্রী সারা যখন মারা যান তখন ফিলিস্তীনীদের নিকট থেকে তাকে কবর দেয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থণা করতে হয়। (সাফারুত তাকভীন, ফা ২৩)

ইসহাকের বয়স যখন ৬০ বছর তখন তার সন্তান ইয়াকুব জন্মগ্রহণ করে। ইসহাক ১৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনিও কোন জমির মালিক ছিলেন না। ইয়াকুব তার পিতার মৃত্যুর পর সন্তান সন্ততিদের নিয়ে মিসর চলে যান এবং সেখানে ১৪৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যখন তিনি এখানে আসেন তখন তাঁর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা ছিল ৭০ জন আর তাঁর বয়স ছিল ১৩০ বছর।

এর অর্থ দাঁড়ায় যে, ইবরাহীম তাঁর পুত্র ইসহাক এবং পৌত্র ইয়াকুব মিলে ফিলিস্তীনে ২৩০ বছর বসবাস করেছিলেন। এখানে তাঁরা ছিলেন বিদেশী হিসেবে। তাঁরা এখানকার এক বিঘত জমিরও মালিক ছিলেন না।

তাওরাতের বক্তব্য হল, হযরত মুসার নেতৃত্বে বনী ইসরাইলীরা মিসর ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত ৪৩০ বছর পর্যন্ত বসবাস করেছিল। (সাফারুত তাকভীন, ফা ১৫) তারাও ছিলেন বিদেশী, কোন কিছুর মালিক ছিলেন না। তাওরাতের ভাষ্যমতে মুসা এবং বনী ইসরাইলরা সীনাই মরুভূমিতে ৪০ বছর কাটায় অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ওয়াদা তাদের জন্য হয়েছে তা এসেছে ৭০০ বছর পর। তারা ফিলিস্তীনের কোন কিছুর মালিক ছিল না। প্রশ্ন দাঁড়ায়, কেন আল্লাহ তাদের জন্য তাঁর ওয়াদাকে এতদিন বাস্তবায়ন করেন নি?

মারা গেলও মুসা ফিলিস্তীনের ভূমিতে প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি পূর্ব জর্ডানে প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানেই মারা যান। তাঁর পরে যিনি প্রবেশ করেন তিনি হলেন ইয়াশুয়া (ইউশা) এবং তিনি এর অধিবাসীদের বিতাড়িত করেন এবং একে বনী ইসরাইলের গোত্রগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেন। বনী ইসরাইলের জন্য কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেননি। বরং তাঁর পরে বিভিন্ন বিচারকেরা ২০০ বছর পর্যন্ত এ অঞ্চল শাসন করে। বিচারকদের পরে এ অঞ্চল শাসন করে বিভিন্ন রাজারা। যেমন শাউল, দাউদ এবং সোলাইমান। তারা

একশ বছরের কম সময় শাসন করেন। এটি হচ্ছে তাদের রাজত্বের সময় এবং এটিই হচ্ছে তাদের স্বর্ণ যুগ। সুলাইমানের পর এ রাজ্য তার সন্তান ইয়াহুযার ভাগে যায় উরশালিম এবং ইসরাইলের যায় শকীম (নাবলুস)। তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং তা কোনক্রমেই বন্ধ হয়নি। শেষপর্যন্ত বাবেলীয়রা তাদের উপর আক্রমন করে বসে এবং তাদের ধ্বংস করে দেয়, স্তম্ভ এবং উরশলীমকে গুড়িয়ে দেয়, তাওরাতকে পুড়িয়ে ফেলে এবং তাদের মধ্যে যারাই জীবিত ছিল তাদের সকলকে দাস বানিয়ে নেয়। যেমনটি ইতিহাস থেকে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে শায়খ আবদুল মুয়িয আবদুস সাত্তার তাঁর "হে ইসরাইল সময় ঘনিয়ে এসেছে" নামক গ্রন্থে লিখেন,

"ফিলিস্তীনে যতদিন তারা বিধ্বস্তকারী, লুটেরা যোদ্ধা হিসেবে বসবাস করেছে তা যদি যোগ করা হয় তবুও তা ইংরেজরা ভারতে এবং হল্যান্ডের অধিবাসী বা ডাসরা ইন্দোনেশিয়ায় যতদিন রাজত্ব করেছে তার সমান হবে না। এর ফলে যদি কারও ঐতিহাসিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তাহলে ইংরেজরা ভারত, হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়ায় তাদের মত দাবী করতে পারে।

যদি তারা বিদেশী হিসেবে থাকার সময় ফিলিস্তীনের পরিবর্তে মিসরের মালিকানা দাবী করত তাহলে সেটাই ভাল ছিল।মিসরে তারা ৪৩০ বছর বসবাস করেছিল। আর ফিলিস্তীনে ইবরাহীম ও তার সন্তানেরা দু'ইশ বছর বা এর চেয়ে কিছুদিন বেশী বসবাস করেছিল। তারা এতে এসেছিল দুইজন মাত্র। আর এ থেকে বের হবার সময় সংখ্যা ছিল সত্তর জনের।

কিন্তু এই ইহুদীরা ফিলিস্তীনের ভূমির মালিকানাই একমাত্র দাবী করে না। তারা দাবী করে গোটা দুনিয়ার মালিকানা। মহান আল্লাহ বলেন,

«وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ»- (الرحمن : ١٠)

অর্থাৎ- এই পৃথিবী সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা রহমান ঃ ১০)

আর এরা বলে, যখন প্রভূ বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীকে ভাগ করছিলেন এবং আদম সন্তানদের বিভক্ত করছিলেন তখন ধরাপৃষ্ঠকে বনী ইসরাইলের কর্তৃত্বে দিয়ে দিয়েছিলেন। (সাফারুত্ তাসনিয়া, ফা ২৩) তারা বলে যে, সাফারে ইয়াশুতে বর্ণিত হয়েছে, যে ভূমি তোমাদের পায়ের তলায় পড়বে তা-ই তোমাদের হয়ে যাবে। এই নীতির ও আইনের ধারায় তারা মিসরের ভূমির ওপরই মালিকানা দাবী করতে পারে যাতে তারা পা মাড়িয়ে ছিল। কিন্তু ১৯৬৭-র জুন বিপর্যয়ের

সময় (যখন গাজা ও গোলান হাইট সহ বিস্তীর্ণ এলাকা ইসরাইল দখল করে নেয়) এসোসিয়েট প্রেসের এক প্রতিনিধি একজন ইসরাইলী সৈন্যকে প্রশ্ন করে, ইসরাইল রাষ্ট্রের সীমানা কোথায়? সে উত্তরে বলেছিল, যেখানে আমি পা রাখবো এবং এটা বোঝানোর জন্য সে তার বুট দিয়ে মাটিতে আঘাত করেছিল। (আল আখবার, ১০ই জুন ১৯৬৭)

তারা যে ঐতিহাসিক অধিকারের দাবী করে, শায়খ আবদুল মুয়িয- এর ভাষ্যমতে তা একরকম জবরদস্তি, জোর ও গুয়ার্তুমী। কেননা তারা ফিলিস্তীনে বিদেশী হিসেবেই বসবাস করেছিল যেমনটি তাদের তাওরাতেই (আসফারে) বর্ণিত রয়েছে। কোন বিদেশী বা পথিক কি সে জমিনের দাবী করতে পারে, যা সে অতিক্রম করেছে বা সেই গাছের দাবী করতে পারে যার ছায়ায় সে বিশ্রাম নিয়েছে? তারা সেখানে কর্মী বা বিনিয়োগকারী হিসেবে থাকেনি। তারা ছিল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাঝে এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ যা সব সময় অব্যাহত ছিল নিজেদের মাঝে (ইয়াহুদা ও ইসরাইলের মাঝে) এবং তাদের ও ফিলিস্তিনীদের মাঝে।

তারা যে ফিলিস্তিনীদের হত্যা করেছিল তার সংখ্যা ছিল দু'লাখ। (সাফারুল কাজা) দাউদ একাই এরপর হত্যা করেন একলাখ লোককে। (তাদের কিতাবের বক্তব্য অনুযায়ী) এরপর তাদের ওপর ব্যাবিলনীয়রা আক্রমন করে এবং তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে। তারা ব্যাবিলনীয়দের হাত থেকে কোন মতে বাঁচতে না বাঁচতেই তাদের ওপর রোমানীয়রা আক্রমন করে বসে এবং তাদেরকে একেবারেই দুমড়ে মুচড়ে টুকরো টুকরো করে ছাড়ে। এরপর আসে ইসলামী বিজয় তখন তারা ছিল ভূমি থেকে বিতাড়িত শরণার্থীর মত। তারা ওরশেলীমে বসবাস থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি ফিলিস্তীনে খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মযাজক সাফারিউস আমিরুল মুমেনীন হযরত উমর ফারুকের নিকট চাবি সমর্পনের সময় শর্তারোপ করেন, যেন তিনি ইহুদীদেরকে (ইলায়) প্রবেশের অনুমতি না দেন বা এতে বসবাসের অনুমতি না দেন। আরবরা যখন এখানে প্রবেশ করে তখন তা ছিল ইহুদী মুক্ত। রোমানরা তাদেরকে ইতিপূর্বে বিতাড়িত করেছিল। এর অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে এবং আরবরা এতে বিগত এক হাজার চারশ বছর ধরে বসবাস করে আসছে। তাতে কি ইহুদীদের মত তাদের ঐতিহাসিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হয় না? (বিস্তারিত দেখুন, হে ইসরাইল অঙ্গিকার নিকটবর্তী, শায়খ আবদুল মুয়িয আবদুস সাত্তার, পৃ. ১৭)

চুলচেরা আলোচনা

আমরা এখানে অতি সুক্ষ্মভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করবো যাতে ইহুদীদের ঐতিহাসিক দাবীর অসারতা প্রমাণ করবে যেমনটি তারা ধারনা করে যে, গোটা ফিলিস্তীন ছিল তাদের বাপ-দাদাদের ভূমি।

'ইহুদীদের ইতিহাস' কী বলে?

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, দাউদ (আ.) যার ব্যাপারে বলা হয় যে, তার সময় ইসরাইলী রাজ্য সবচেয়ে বেশী সম্প্রসারিত হয়েছিল। তিনিও ফোরাত ও নীল এর- অববাহিকায় কেনানীদের ভূমির উপর এবং ফিলিস্তীনের পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এসবের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে ঐতিহাসিকভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসরাইল যে বিরাট এলাকায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে তা অতীতে নয় বরং বর্তমান যুগে যখন সে পুরো ফিলিস্তীন, গোলান হাইট, দক্ষিণ লেবানন এবং সিনাই অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে প্রথম বারের মত ১৯৬৭ সালে। দাউদের সময় ইসরাইলী উপস্থিতি ছিল খুবই সীমিত। তা ফিলিস্তীনি উপকূলীয় এলাকায় ছিলনা, উত্তর ফিলিস্তীনের খলীলে ছিলনা, তাল্লুল কাযীর একটা ছোট্ট এলাকায় কর্তৃত্ব সীমিত ছিল এমনকি দক্ষিণের নুকুব মরুভূমিতেও ছিলনা। এ আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, ইসরাইলীদের কর্তৃত্ব ছিল উত্তরে তাল্লুল কাযীর পাহাড়ী এলাকা থেকে দক্ষিণে বিরে সাবা পর্যন্ত।

আমরা দেখতে পাই ধর্মযাজকরা কিভাবে তাদের 'আহলে কাদীম' পুরাতন যুগের ঘটনাবলীকে বিকৃত করেছেন এবং মিসরের তৃতীয় টাহুতামিস্ ইতিহাসের প্রসিদ্ধ বাদশার যুদ্ধের ঘটনাকে নিজেদের ঘটনা বলে চালিয়ে দিয়েছেন। রাজার রাজ্য নীল নদ থেকে টাইগ্রীস (ফোরাত) পর্যন্ত। যেমনটি আমরা কারাঙ্গ প্যাগোডা র দেয়ালে অংকিত নকশায় দেখতে পাই। এটিকে তারা তাদের বাদশাহ দাউদের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। বরং মিসরীয় যে সূত্র থেকে তারা বর্ণনাটি নিয়েছে তাও মুছে ফেলেনি, এমনকি কোন রকমের পরিবর্তন ছাড়াই তা হুবহু মূল বর্ণনার মতই রেখে দিয়েছে। এজন্যই প্রকাশ পেয়ে যায় যে, অন্যান্য ঘটনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা আমরা দেখতে পাই যে, দাউদ হলেন ইসরাইলের বংশধর, আর তার সাথে দিল ৬০০ সৈন্য। দাউদ (আ.) ইসরাইলী গোত্রগুলোর মাঝে অথবা ফিলিস্তীনিদের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত।

হঠাৎ দেখা যাচ্ছে এক বিরাট যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ যাতে এক সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন দুর্ভেদ্য স্থানে আঘাত হানছে। এতে ধর্মযাজকরা ঐতিহাসিকভাবে ঘটনাটি সত্য কি না সেদিকে কোনই ভ্রুক্ষেপ করেনি। তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এসব বিজয়ের কথা বলে সাধারণ ইহুদীদের মুসার দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করা যেন তাদের প্রভু তাদেরকে শত্রুদের ওপর বিজয় দান করেন। (ইহুদীদের ইতিহাস, আহমাদ উসমান, খ. ১, পৃ. ১৩৬-১৩৭)

আমরা সংক্ষেপে হলেও ব্যাবিলনীরা ও রোমনরা বনী ইসরাইলীদের সাথে কি করেছিল উল্লেখ করবো। তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে এদের অন্যায় ও অত্যাচার এবং ঔদ্ধত্বের উত্তর করেছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯৭ সালে নবুখুজ নসর ব্যাবিলনীয় রাজা ওরশিলীমের ওপর আক্রমণ চালায় এবং এর অধিকাংশ অধিবাসীকে ব্যাবিলনে দাস হিসেবে বন্দী করে নিয়ে আসে। মিসরের ইন্ধনে শহরের অবশিষ্ট লোকেরা তাদের নতুন কর্তৃপক্ষের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এর ফলে ব্যাবিলনের বাদশা স্বয়ং ফিরে আসেন এবং ওরশিলিমের ওপর অবরোধ আরোপ করেন যা দু'বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৮ সালে)। এরফলে শহরের লোকজন আত্মসমর্পন করে এবং শহরটিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। এতে একমাত্র দুর্বলরাই নিষ্কৃতি পায় এবং অবশিষ্ট লোকজনকে বন্দী করে ফোরাত নদীর কুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

উস্তাদ মুহাম্মদ সোবাইহ বলেন, সে সময় থেকেই ফিলিস্তীনে ইহুদী রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। সেখানে তাদের কোন ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব ছিল না, শুধু গোত্র হিসেবে ইবরাহীম (আ.) এর বংশধর হিসেবে পরিচিতি ছিল।

এটা ছিল ইহুদীদের ওরশিলীমে সেই ইসরাইলী রাষ্ট্রের শেষ অবস্থা, যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দাউদ (আ.)। এরপর তাঁর মৃত্যুর পর তা ভাগ হয়ে যায়। হযরত সুলাইমানের পরে কিড়ি জন বাদশাহ তাদেরকে শাসন করেন ব্যাবলীয়দের হাতে বন্দী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এটা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৯৩০ সাল (সোলাইমানের মৃত্যু) থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ সাল পর্যন্ত।

আর উত্তরের রাজ্য যার নাম ছিল ইসরাইল এবং এর রাজধানী ছিল শকীম (নাবলুস), সেটিকে সোলাইমানের দ্বিতীয়পুত্র হাকীম শাসন করেন খ্রীষ্টপূর্ব ৯৩০ সালে এবং এটির অস্তিত্ব খুব দ্রুত শেষ হয়ে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৭২১ সালে

ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় সারজুন একে আক্রমণ করে এবং এর অস্তিত্বকেই ধ্বংস করে দেয়। তিনি এর সকল অধিবাসীকে টাইগ্রীসের পূর্বপ্রান্তে স্থানান্তরিত করেন। তাদের স্থানে রাফেদীদের বংশধরকে বসবাসের জন্য নিয়ে আসেন। সে সময় ইসরাইলের রাজার সংখ্যা ছিল ১৯ জুন। এরা বিভিন্ন বন-বাদাড়ে পৌত্তলিকদের সাথে মিলেমিশে বসবাস করতেন। কারণ সে সময় তারা ছিল ওরশিলীমে বসবাসরত তাদের চাচাত ভাইদের আক্রমনের মুখে।

যদি আমরা এই দুই রাষ্ট্রের সময় যোগ করি তাহলে দেখতে পাই যে ইয়াহুদার ওরশিলিম ছিল ৪৩৪ বছর। যার বাদশা ছিলেন শাউল, দাউদ এবং সোলাইমান আর ইসরাইলের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ২৯৮ বছর শাউলের যুগ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০২০ সাল পর্যন্ত।

এথেকে আমরা জানতে পারি যে, ইহুদীদের রাজ্যের সীমা ফিলিস্তীনের একটা সীমিত অঞ্চলে ছিল যা হযরত ঈসা (আ.) এর জন্মের প্রায় ছয় বছর পূর্বেই শেষ হয়ে যায়। আর ২৫ শতাব্দী পরে এসে তারা এই ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি ঘটাতে চাচ্ছে। কোথায় তাদের ইতিহাস আর কিভাবেই তাদের প্রত্যাবর্তন?

আমরা এখানে আলোচনা করছি একখন্ড ভূমিতে রাজত্ব ও কর্তৃত্বের এবং তার অবসানের কিন্তু ফিলিস্তীনে ইহুদীদের উপস্থিতি কিছু দিন পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। রোমানদের রাজত্ব পর্যন্ত ৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিলম্বিত হয় যেমনটি আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব।

কুরআনে ইসরাইলীদের দুর্নীতি ও তাদের শাস্তির বর্ণনা

কুরআন মজীদে এ দুটি পরিসমাপ্তির কথা– ব্যাবিলনীয়দের কর্তৃক তাদের বন্দী করে তাদের কর্তৃত্ব ধ্বংস করা এবং রোমীয়দের দ্বারা তাদের অস্তিত্বই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বিবৃত হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলের (সূরা ইসরা) নিম্নোক্ত আয়াত সমূহে তা লক্ষ্য করা যায়ঃ

وَقَضَيْنَا اِلَى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ـ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُوْلٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلاً ـ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ

وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ـ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ قف وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ط فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا ـ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ج وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا »ـ(الاسراء : ٤-٨)

"আমরা বনি ইসারইলীদের প্রতি আমাদের কেতাবের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, অবশ্যই তোমরা দু'বার আমার জমিনে বিপর্যয় (ফাসাদ) সৃষ্টি করবে এবং মানুষের ওপর বড়ো বেশী বাড়াবাড়ি করবে।(৪) অতপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার বান্দাদের প্রেরণ করলাম যারা ছিল কঠোর। অতপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল (তোমাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল), এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল।(৫) এরপর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম।(৬) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন তোমরা প্রথমবার ঢুকেছিলে এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।(৭) হয়ত তোমাদের প্রভূ তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করবেন। কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফেরদের জন্যে কয়েদখানা করেছি।"(৮) (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪-৮)

সূরা ইসরার আয়াত এবং বর্তমান যুগের কতিপয় আলেমের অভিমত

বর্তমান যুগের কতিপয় আলেম যেমন শায়খ আল-আশরাবী, শায়খ আবদুল মুইজ আবদুস সাত্তার এবং অন্যান্যরা মনে করেন যে, প্রথমবার বিপর্যয় ছিল নবুওয়তের যুগে ওহী নাযিলের পরপরই। এটি করেছিল বনী কুরাইযা, বনী কাইনুকা ও বনী নাজীর এবং খায়বারের অধিবাসী ইহুদীরা। তারা রাসূল (সা.)

ও তাঁর সাহাবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিদ্রোহ, চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদীদের বিরুদ্ধে তাঁদেরকে বিজয়ী করেন।

তাদের ওপর শক্তিমান ছিলেন নবী ও তার সাহাবীরা। এর প্রমাণ হলো তাদেরকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে তাদের প্রশংসা করেছেন 'আমাদের বান্দা' বলে। আর তাদের দ্বিতীয় বিপর্যয় বা ফাসাদ যা তারা আজ করেই যাচ্ছে চরম বর্বরতা, নিষ্টুরতা রক্ত ঝরান ও হত্যাযজ্ঞ এবং মানবাধিকার লংঘন করে।

আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তিনি তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা এবং শাস্তি দিবেন তাদের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয়ী করে, যেমন ইতিপূর্বে করেছিলেন।

আমাদের নিকট এ ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়

আমরা এ অভিমতকে গ্রহণ করতে পারি না। কেননা, কয়েকটি কারণে এ ব্যাখ্যাটি দুর্বল ঃ

প্রথমত ঃ মহান আল্লাহর বাণী, "আমরা বনি ইসারাইলীদের প্রতি কেতাবের মধ্যে ঘোষণা দিয়েছিলাম" অর্থাৎ আমরা তাদেরকে কিতাবের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম এর অর্থ হচ্ছে তাওরাতে বলে দেয়া হয়েছিল। (তাওরাতের আসফারের বর্ণনা মতে) এই দু'টি ঘটনাই ঘটে গেছে। যেমনটি সাফারুত্ তাসনিয়াতু ইস্তিরায় উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ বনী কাইনুকা, বনী নজীর ও বনী কুরাইজা এই গোত্র ৩টি শক্তি ও রাজত্বের ব্যাপারে গোটা বনী ইসরাইলের প্রতিনিধিত্ব করত না । তারা ছিল মূলত ছোট ছোট গুটি কতক গোত্র যা বনী ইসরাইল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

তৃতীয়ত ঃ রাসূল ও তাঁর সাহাবারা তাদের বাড়ীঘরে ঢুকে তাদেরকে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করে দেননি। তাদের তেমন কোন বাড়ি-ঘরই ছিল না।

চতুর্থত ঃ মহান আল্লাহর বাণী 'আমাদের বান্দারা' এর অর্থ এই নয় যে, তাদের নেককার হতে হবে, কেননা মহান আল্লাহ কাফের ও অপরাধীদেরকেও নিজের পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমনটি মহান আল্লাহর এ বাণীতে লক্ষ্য করা যায় ঃ

« ءَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوْا السَّبِيْلَ ».

"তোমরাই কি আমার এই বান্দাদের পথভ্রষ্ট করেছ? নাকি তারাই পথ হারিয়েছে? (সূরা ফুরকান ঃ ১৭)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

«قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ »۔(الزمر : ٥٣)

"বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না।" (সূরা যুমার ঃ ৫৩)

পঞ্চমত ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ

"এরপর আমি তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম ....।" এতে তাদের ওপর মহান আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হবার কথাই উল্লেখ হয়েছে। আর মহান আল্লাহ বনী ইসরাইলকে অনুগ্রহ করে মুসলমানদের ওপর তাদেরকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রদান করেন নি।

যষ্ঠত ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাইলকে প্রথমবার শাস্তি দেয়ার পর তার শত্রুদের বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন কেননা তারা ভাল করেছিল এবং নিজেদের সংশোধন করেছিল। যেমন আল্লাহ বলেন, "তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে।" (ইসরা ঃ ৭)

আর যেমন আমরা জানি এবং দেখছি, ইহুদীরা কক্ষনো ভাল কাজ করেনি এবং সংশোধনও হয়নি। এজন্য আল্লাহ্ তাদের ওপর হিটলার ও অন্যান্যদেরকে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি এক জালেমকে দিয়েই আরেক জালেমকে ধরেন। তারা প্রায় শত বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে, যেন আমাদের ভূমি চুরি করে নেয়। তারা কখন ভাল কাজ করল যে আল্লাহ তাদের হাতে কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দিবেন?

সপ্তমত ঃ শেষে মহান আল্লাহ বলছেন, "আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন তোমরা প্রথমবার ঢুকেছিলে"এবং তাদের বর্ববরতার প্রতিদান করবে। (সূরা ইসরা ঃ ৭)

মুসলামানেরা তাদের মসজিদে তরবারী নিয়ে বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রবেশ করেনি এবং তাদের বর্বরতা ও ঔদ্ধত্বতার প্রতিবাদ করেনি। বরং

মুসলমানেরা কোন যুদ্ধে বা বিজয়েই কারো ওপর নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা চালায়নি। এটা করেছে ব্যাবিলনীয়রা ও রোমানরা,তারা ইসরাইলীদের ওপর চড়াও হয়েছিল।

অষ্টমত ঃ পূর্বকার মুফাসসেরীনরা সবাই একমত যে, তারা দু'বার বিপর্যয় ঘটিয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রত্যেকটাতেই তাদেরকে শায়েস্তা করেছেন। এর চেয়ে আর কোন কঠিন ও নির্মম শাস্তি হতে পারে না যা তারা ব্যাবিলনীয় হাতে পেয়েছে যাতে তাদেরকে পরাজিত, বন্দী এবং তাদের রাষ্ট্রের অস্তিত্বকেই মুছে ফেলেছে এবং তাদের স্তম্ভকে গুঁড়িয়ে দেয়। আর রোমানরা ফিলিস্তিনে তাদের অস্তিত্বকেই শেষ করে দেয় এবং তাদের বিতাড়িত করে ছাড়ে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "তাদেরকে পৃথিবীতে বিভিন্ন দলে দলে টুকরা টুকরা করে ছাড়ি।" (আ'রাফ ঃ ১৬৮)

একথা পরিস্কার যে, তারা এখন মহান আল্লাহর এ অমোঘ নীতির আওতায় পড়েছে, "যদি তোমরা ফিরে এসো আমরাও ফিরে আসবো।" তারা আবার বিপর্যয়, বর্বরতা ও শত্রুতায় ফিরে এসেছে। আল্লাহর নিয়মে তারা আবার শাস্তি পাবে যা তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিবে ও তাদের অপকর্ম বন্ধ করবে এবং তারা নিজেদের ওজন ও আবস্থা বুঝাতে পারবে। কবি বলেন,

যদি বিচ্ছু ফিরে আসে, জুতা নিয়ে আমরাও ফিরবো

কেননা, জুতাই তার জন্য উপযুক্ত।

মহান আল্লাহর এ বাণী সে কথারই যথার্থতা বর্ণনা করে ঃ

«وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ»۔ (الاعراف : ١٦٧)

"আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তোমার প্রভূ সংবাদ দিয়েছেন যে, অবশ্যই কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাদের (ইহুদীদের) ওপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দান করতে থাকবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৬৭)

ব্যাবিলনীয়দের হাতে তারা প্রথম মর্মান্তিক শাস্তি পেয়েছিল এবং কুরআন এ ব্যাপারে যেভাবে বর্ণনা করেছে তা আমরা দেখেছি। এটার প্রভাব ছিল ইহুদীদের

ওপর খুবই মারাত্মক। এতে ফিলিস্তীন থেকে তাদের অস্তিত্বই প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায় বলা চলে। আর দেখা যায় যে, অতি সহজেই ব্যাবিলনীয়রা সারজুন কর্তৃক ইসরাইলের লোকজনকে অতঃপর ইহুফর এলাকার লোকজনকে বুখতেনাসর কর্তৃক বহিস্কৃত করা হয়। এর কারণ, ফিলিস্তীনে তাদের শিকড় মজবুত ছিলনা। আমরা যদি ধর্মশালা এবং সোলায়মান প্রাসাদ বাদ দেই তাহলে তাদের চিহ্ন ছিলই না বলা চলে। আমরা বড় জোর বলতে পারি, তারা কেনানীদের ভূমির কিছু অংশে বসবাস করেছিল যাতে ছিল ছোট ছোট কিছু গ্রাম এমনকি শহরগুলোও ছিল গ্রামের মতই একমাত্র ওরশিলীম ও শকীম ছাড়া। (কুদস ও আমাদের বৃহত্তর যুদ্ধ, মুহাম্মদ সুরাইহ, পৃ. ২১৮-২২০)

ইসলামের বিজয়

মুসলমানেরা হযরত উমর (রা.)-এর সময় জেরুজালেম বিজয় করে, যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এটি তারা ইহুদীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেনি, এমনকি সেখানে একজন ইহুদীও ছিল না। রোমনরা একে তাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল এবং তাদের চারশ বছরের উপস্থিতিকে শেষ করে দেয়। খ্রীষ্টান ধর্মযাজক বেতরীকুল হযরত উমরের সাথে শর্তারোপ করেন যেন তিনি এতে ইহুদীদের বসবাস করতে না দেন। হযরত উমর এ শর্ত মেনে নেন এবং তাঁর অঙ্গীকার সম্মানের সাথে যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিক ভাবে বাস্তবায়িত হয়ে আসতে থাকে। কেননা মুসলমানেরা খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত মেনে চলতে নির্দেশিত। আর নিঃসন্দেহে হযরত উমর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এরপরে আসে আরেক যুগ যখন হযরত উমরের উপর মিথ্যাচার করে "ইহুদীদের বায়তুল মুকাদ্দাসে বসবাস করতে দেয়া যাবে না" বাক্যটি মুছে দেয়া হয়। আমরা জানিনা কখন এই জালিয়াতিটা ঘটে। এর ফলে মুসলমানদের অসতর্কতার সুযোগে ইহুদীদের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। (জেরুজালেম ও আমাদের বৃহত্তর যুদ্ধ, পৃ. ৩২৭-৩৩০০)

এই পবিত্র নগরীতে কি ঘটেছিল যখন তা ক্রুসেডাররা দখল করে নিয়েছিল? তারা এ মসজিদকে কেন্দ্র করেই ষাট হাজার লোককে হত্যা করেছিল এবং তাদের হাতে বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ নব্বই বছর পর্যন্ত বন্দী ছিল। পরিশেষে বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইউবী এসে একে মুক্ত করেন ১১৮৭

সালে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে বিখ্যাত তাইন যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে। এটি ছিল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি যা শুরু করেছিলেন তাঁর পূর্বে দু' মহান সেনাপতি এমাদদ্দীন জঙ্গী এবং তাঁর পুত্র নুরুদ্দীন মাহমুদ (শহীদ)। ইতিহাস ফিলিস্তীনে ইহুদীদের উপস্থিতির ব্যাপারে কোনই ভ্রুক্ষেপ করেনি এবং তাদের কোন গুরুত্বই দেয়নি। ইসলাম তাদের সাথে সংখ্যালঘুদের মতই আচরণ করেছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রে তারা খুব সম্মান, মর্যাদা এবং ইনসাফের ভিত্তিতে বসবাস করে।

যায়নবাদ কর্তৃক ওসমানী সাম্রাজ্যের ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা

ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে, বর্তমান যায়নবাদীরা ওসমানী রাষ্ট্রের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করার চেষ্টা চালায়। বিশেষ করে শেষ দিকে এবং রাষ্ট্রের দুর্বলতার সময়ে যেন ইহুদীদের ফিলিস্তীনের জমির মালিক হওয়ার সুযোগ দেয়া হয়। সর্বশেষ খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ এর সময় তারা বিভিন্নভাবে চাপ দেয়। কিন্তু তিনি এক্ষেত্রে এক সমুজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন যা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

লেবানন থেকে প্রকাশিত আন্‌নাহার পত্রিকায় ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ড. হাস্‌সান হাল্লাক লিখেছেন, যখন দ্বিতীয় আবদুল হামীদ (১৮৭৬-১৯০৯) ক্ষমতায় বসেন তখনই তিনি ইহুদী কর্তৃক ফিলিস্তীন ভূমি ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন। এজন্য তিনি একেবারে শুরু থেকেই অনেক বাদশাহী ফরমান জারী করেন যাতে ফিলিস্তীনে ইহুদী আগমন ঠেকানো যায়। ১৮৮২ সালে এ লক্ষ্যে নতুন আদেশ জারী করা হয় যখন যায়নবাদীরা তাদের বিভিন্ন বন্ধু সংগঠন কর্তৃক ফিলিস্তীনে ইহুদী বসতি স্থাপনের জন্য অনুমতি লাভের চেষ্টা চালায়। এসময় লরেন্স ওলিফ্যান্ট (L.L. Olphant) চেষ্টা করেন যেন আমেরিকার রাষ্ট্রদুত ইষ্টেরওয়াস ফিলিস্তীনে ইহুদী আগমনের জন্য বাদশার কাছে অনুমতি লাভে সহায়তা করেন। কিন্তু তার এই চেষ্টা বাদশা ও রাজ বংশের কাছে ব্যর্থ হয়। বাদশা দ্বিতীয় আব্দুল হামীদের জবাব ছিল, "ইহুদীরা রাজ্যের যে কোন অংশে শান্তিতে বসবাস করতে পারে কিন্তু ফিলিস্তীনে নয়। ওসমানীয় খেলাফতে আগত ইহুদীরা রাজ্যের প্রজা হতে পারে এবং তাদের বেলায় রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন প্রযোজ্য হবে।"

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদ এ জন্য ফিলিস্তীনে একদল তত্ত্বাবধায়ক

নিয়োগ করেন যাদের দায়িত্ব হল ইহুদী আগমন বন্ধ করা, এর প্রধান ছিলেন রউফ পাশা (১৮৮৬-১৮৮৮)। যখন উসমানীয় সরকার নিশ্চিত হন যে, কতিপয় পশ্চিমা সরকার গোপনে ইহুদী আগমনে সহায়তা করছে, তখন সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ফরমান জারী করা হয় (২৯শে জুলাই ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ) যেন বিদেশীদেরকে ফিলিস্তীনে প্রবেশে বাধা দেয়া হয় এবং এ ফরমানটি পূণ পূণ প্রচার করা হয়। আর এ বিষয়টি সকল বিদেশী মিশনকে জানিয়ে দেয়া হয় এবং উসমানীয় খেলাফতে ইহুদী আগমন বন্ধ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়।

বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নথিপত্র একথার প্রমাণ করে যে, ওসমানী সাম্রাজ্যের অবস্থান ইহুদী আগমনের ব্যাপারে কঠোর ছিল। এরমধ্যে ফিলিস্তীনে বৃটেনের কনস্যুলার ডিকসান (Dichson) এর রিপোর্ট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তার ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯২ এর রিপোর্টে ইঙ্গিত করেন যে, উচ্চ পর্যায় থেকে ইহুদীদের হিজরত করে ফিলিস্তীনে বসবাস করার কোন অনুমতি নেই। কেবলমাত্র ভিজিটর হিসেবে আসার অনুমতি রয়েছে। যে কেউ এসে এক বা দু' মাস থেকে এরপর চলে যেতে বাধ্য। এরপর ইহুদী নেতা টিয়োডোর হার্টঝেল চেষ্টা করেন যেন খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামীদের নিকট থেকে ফিলিস্তীনে ইহুদীদের নিয়মিত প্রবেশ করার সরকারী অনুমতি লাভ করা যায়। এজন্য তিনি ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, আমেরিকা এবং কিছু তুর্কী লোকজনকে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে কাজে লাগান।

যখন সে তার প্রচেষ্টা বিফল হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হল তখন হার্টঝেল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সাধনকে জরুরী বলে মনে করে । সে বলেছিল, ওসমানী খেলাফতের বিলুপ্তির সাধন অথবা একে খন্ড-বিখন্ড করাই ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র সমাধান। যদি অদূর ভবিষ্যতে তুরস্ককে বিভক্ত করা যায় তাহলে যায়নবাদী রাষ্ট্র যা ফিলিস্তীনে প্রতিষ্ঠিত হবে তা তার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তবে সুলতান যদি ইহুদী দাবী ও প্রস্তাব মেনে নেন তাহলে তা যায়নবাদের রাজনীতির দিকেই ঝুঁকবে তাহলে আমরা বাদশাহকে বিরাট আর্থিক সহায়তা দান করব। তিনি আমাদের জন্য একখন্ড জমিন ছেড়ে দিবেন যার মূল্য তার কাছে তেমন কিছুই নয়। (হার্টঝেল ডাইরী, ১৩ই এপ্রিল ১৮৯৬)

হার্টঝেলের প্রথম ইস্তাম্বুল সফর ছিল ১৮ই জুলাই ১৮৯৬ সালে। তখন তিনি

একজন সাংবাদিক হিসাবে সফর করেন, যায়নবাদী নেতা হিসেবে নয়। এরপরে তিনি আরো কয়েকবার সফর করেন। কিন্তু এতে কোন ফল হয়নি। সুলতান আবদুল হামীদ এ ব্যাপারে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। হার্টঝেল ও তার মধ্যস্ততাকারীরা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। হার্টঝেল তার ব্যক্তিগত ডাইরীতে খলীফা দ্বিতীয় আবদুল হামীদের বক্তব্য এভাবে লিখেছেন, "আমি দেশের এক বিঘত জমিও বিক্রি করার ক্ষমতা রাখিনা, কেননা তা আমার নয়, আমার জনগণের। আমার জনগণ এই সাম্রাজ্য রক্ত ঝরিয়ে অর্জন করেছে এবং এরপর রক্ত দিয়ে যুদ্ধ করেছে। আর কাউকে তা কেড়ে নেয়ার সুযোগ দেয়ার পূর্বে অবশ্যই আমরা রক্ত দিয়ে ভরে দিব। আমি কাউকে এর সামান্যতম অংশ দিতে পারি না। ইহুদীরা তাদের বিলিয়ন বিলিযন ডলার নিয়েই থাকুক। যদি সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায় তাহলে ইহুদীরা বিনা পয়সায় ফিলিস্তীন পেয়ে যাবে। আর আমাদের লাশের উপরই সাম্রাজ্য ভাগ হবে। আমরা কোন উদ্দেশ্যেই ভাগ বন্টন গ্রহণ করব না।" (হার্টঝেল ডাইরী, ১৯শে জুলাই ১৮৯৬, পৃ. ৩৮৭, আরবী অনুবাদ পৃ. ৩৫)

হার্টঝেল ১৯০৪ সালে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চেষ্টা চালাতেই থাকে যেন ফিলিস্তীনে ইহুদীরা সরকারীভাবে আগমনের অনুমতি লাভ করে। সে তার সকল প্রচেষ্টাতে ব্যর্থ হয়। এজন্য সে মরার পূর্বে চিন্তা করে, কিভাবে দ্বিতীয় আবদুল হামীদকে সিংহাসন থেকে নামানো যায় এবং যায়নবাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবেও যায়নবাদের নেতারা দেখল যে, আন্তর্জাতিক শক্তির সাথে যোগাযোগ করা দরকার যারা ওসমানী সাম্রাজ্যের পতন বা একে ভাগ করতে চায় এবং তুরস্কের সুলতান বিরোধী শক্তির সাথে যারা "যুব তুর্কী" সংগঠনের ব্যানারে কাজ করছে। আর এর অংগ সংগঠন হল "আল-ইত্তেহাদ ওয়াত্তারাক্কী" (ঐক্য ও প্রগতি)। এ সংগঠনটি তুরানী সংগঠন, কট্টর আরব বিদ্বেষী এবং সর্বক্ষেত্রে আরবদের বৈরী। এজন্য যায়নবাদ, মাসুনী, তুরানী ও আন্তর্জাতিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং সুলতানকে তার সিংহাসনচ্যুত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। কারণ তিনি সিংহাসনে থাকলে যায়নবাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

বৃটেন ও তুর্কী নথিপত্র ইঙ্গিত বহন করে যে, "আল-ইত্তেহাদ ওয়াত্তারাক্কী" (ঐক্য ও প্রগতি) সংগঠনটি গঠনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামকে ধ্বংস করা।

এটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই এর কোন একজন নেতাও আসল তুর্কী বংশোদ্ভুত ছিলনা। আনওয়ার পাশা হল মূলত পোলান্ডের এক লোকের সন্তান। জাভেদ ছিল ডোমনা ইহুদী। কারসোহ হল স্পেনীয় ইহুদী। অলয়াত পাশা ছিল বুলগেরীয়ান বংশোদ্ভুত যারা প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেও ভিতরে ভিতরে বিধর্মীই ছিল। আর আহমদ পাশা অর্ধেক ছিল শারাকেশীয় আর অর্ধেক পোল্যান্ডীয়। তেমনিভাবে নাসিম রোসো ও নাসিম মাজলিফাজ ছিল ইহুদী। এরা ছিল তুর্কী যুব সংঘের লোকজন যারা সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামীদের বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটায়।

এই শক্তি সম্মিলিত ভাবে ১৯০৮ সালে বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয় এবং আবদুল হামীদকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন চ্যুত করে। সুলতান আবদুল হামীদ ফিলিস্তীন ও ইসলামের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য চড়ামূল্য দিতে বাধ্য হন। ১৯০৯ সালের পরের ওসমানী সাম্রাজ্য আর ১৯০৮ সালের পূর্বের সাম্রাজ্য এক রকম ছিলনা। নতুন সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন আহমদ জামাল পাশা। এর দ্বারা লেবাননী ও সিরীয় জনগণ ১৯১৫-১৯১৬ সালে চরম দুর্ভোগ পোহায়। এ ব্যক্তি ছিল যায়নবাদী ইহুদীদের ক্রীড়নক,"আল-ইত্তেহাদ ওয়াত্তারাক্কী" (ঐক্য ও প্রগতি) সংগঠনের সদস্য, যারা সারা জীবন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কর্মকান্ড চালিয়েছে।" (আন্‌নাহার পত্রিকা, ২২/৪/১৯৯৭)

এটি ইসলামের বিরুদ্ধে, এর নবীর আকীদা বিশ্বাস, কুরআন ও এর সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শত্রুতা ও বৈরীতা করেছে।

এ আলোচনার সারকথা হল যা আমাদের গবেষক বন্ধু হাস্‌সান হাতহুত বলেন, "ইহুদীরা একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফিলিস্তীনে বসবাস করে। কিন্তু ইতিহাসে সংরক্ষিত রয়েছে, যখন তারা এতে প্রবেশ করে তখন সেটা খালি ছিল না, আর যখন সেখান থেকে চলে আসে তখনও তা খালি বা বিরান ছিল না। এতে তাওরাতে উল্লেখিত ফিলিস্তীনীরা ছিল ইহুদীদের পূর্বে, ইহুদীদের সাথে এবং ইহুদীদের পরেও এবং এখন পর্যন্ত রয়েছে। সুতরাং তাদের ঐতিহাসিক অধিকারের কোন ভিত্তিই নেই। বরং সত্যি কথা হল, এটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক মিথ্যাচার।" (দেখুন, এর দ্বারা আল্লাহ উল্টাবেন, ড. হাস্‌সান হাতহুত, পৃ. ১৮৪)

ধর্মীয় অধিকারের দাবী

ইহুদীরা ধারণা করে যে, ফিলিস্তীনে তাদের ধর্মীয় অধিকার রয়েছে। শায়খ আবদুল মুইজ বলেন, ফিলিস্তীনের প্রধান মুফতী এবং ফিলিস্তীনের সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীন আল-হুসাইনী আমাদেরকে বলেছিলেন, আমি বৃটেনের প্রতিনিধি ও ফিলিস্তীনের শাসকের সাথে দেখা করতে যাই। শাসক বলেন, আমার মা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান, তিনি আপনার আগমনের কথা জানতে পেরেছেন। আমি বললাম স্বাগতম। দেখলাম এক বুড়ি আসলেন এবং এসেই প্রথমে বললেন, আমি তোমার কাছে অনুরোধ করি তুমি মহাপ্রভূর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িও না। আমি তাকে বললাম, মুহতারামা! কে মহাপ্রভূর ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে? তিনি বললেন, তুমি! আমি বললাম, কিভাবে? তিনি বললেন, কেননা তুমি ইহুদীদেরকে ভূমি দিচ্ছ না, যা প্রভূ তাদেরকে দিয়েছেন। আমি বললাম, এটা আমার জমি, আমার ঘর, প্রভূ কিভাবে তাদেরকে দিবেন, আর আমি কোথায় যাব? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর ইচ্ছা। যখন সাক্ষাৎকার শেষ হলো, আমি তার ছেলেকে বললাম, আপনার মা খুবই ভাল কিন্তু তিনি ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি বললেন, না। বরং আমরা প্রোটেষ্ট্যান্টরা এটা বিশ্বাস করি এবং ইঞ্জিলও সেই শুভ সংবাদ দেয়।

বৃটেন যখন 'হোয়াইট বুক' প্রকাশ করে ১৯৩৯ সালে, এতে ইহুদীদের ফিলিস্তীনে মুহাজীরদের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয় ইহুদীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে মিছিল বের করে শ্লোগান দেয় 'হোয়াইট বুক' নয়, 'পবিত্র গ্রন্থ', যাতে ফিলিস্তীনে আমাদের অধিকার দেয়া হয়েছে। 'হোয়াইট বুক' নয়, 'তাওরাত', তা ফিলিস্তীনে আমাদের অধিকার দেয়।

আমরা স্পষ্টভাবে এর প্রভাব দেখতে পাই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের সময় থেকে। আমরা কার্টারের ডাইরীতেও পড়েছি তাতে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে যে, ইসরাইল প্রতিষ্ঠা তাওরাতের বাণীরই বাস্তবায়ন। এটা আমরা রিগ্যান, বুশ ও ক্লিনটনের রাজনীতিতেও লক্ষ্য করি যে, ধর্মীয় খৃষ্টান আরবদের সাথে ইসরাইলী লড়াইকে অন্ধভাবে সমর্থন করছে।

- ইহুদী লেখনী খৃষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাস সৃষ্টিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে বিশেষ করে প্রোটেষ্ট্যান্টদের ওপর। এসব লেখনি তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত

প্রথমত : ইহুদীরা হলো আল্লাহর পছন্দনীয় জাতি এবং সমস্ত জাতিসত্তার ওপর শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান।

দ্বিতীয়ত : ইহুদীদেরকে ফিলিস্তীনের পবিত্র ভূমির সাথে সম্পৃক্ত করে অনেক অঙ্গীকারই করা হয়েছে। আর এ অঙ্গীকার যা তিনি ইবরাহীমকে (আ.) দিয়েছিলেন তা চিরস্থায়ী, কিয়ামত আসা অবধি।

তৃতীয়ত : খৃষ্টানী ঈমানকে যীশুর প্রত্যাবর্তনের সাথে ইহুদী যায়নবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে যুক্ত করে দেয়া অর্থাৎ ইহুদীদেরকে ফিলিস্তীনের ভূমিকে জমায়েত করে যেন তাদের মধ্যে যীশুখৃষ্ট প্রকাশ লাভ করেন।

এ তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আজও লেখা হচ্ছে, যেমন অতীতে লেখা হয়েছে। যায়নবাদীরা খৃষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে ইহুদী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধ্য করা হয়েছে। যায়নবাদী খৃষ্টীয়রা বিশ্বাস করে যে, যীশুখ্রীষ্ট ফিরে আসার পূর্বে তিনটি ঘটনা সংঘঠিত হবে :

১। **প্রথম ঘটনা :** ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়া। এটি ১৯৪৮ সালে হয়ে গেছে।

২। দ্বিতীয় ঘটনা হল : জেরুজালেম শহর দখল করা। ১৯৬৭ সালে এটিও দখল হয়ে গেছে।

৩। তৃতীয় ঘটনা হল : মসজিদুল আকসার ধ্বংস্তুপের ওপর সোলাইমানী স্তম্ভ পূর্ণঃ প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য দীর্ঘদিন ধরে ইসরাইলীরা কাজ করে যাচ্ছে। মসজিদুল আকসার নিচে খনন কার্য চালাচ্ছে ধ্বংসপ্রাপ্ত ইহুদী নিদর্শন অনুসন্ধানের নামে। আর এর প্রথমেই রয়েছে কথিত স্তম্ভ।

আর একথা সবারই জানা যে, স্তম্ভকে বহুপূর্বে ধ্বংস করা হয়েছে। ইহুদীদের খনন কার্য ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তারা এর কোন চিহ্ন পায়নি। আমার ধারনা এই খনন কার্য চালাতে থাকলে মসজিদুল আকাসা ধ্বসে পড়ার ঝুঁকির মধ্যে পড়বে। আমি এটাও ধারনা করি যে, ইহুদীরা জানে এটা কখন ঘটবে। তারাই এটা নির্ধারণ করবে সেই ঘৃনিত দিনটিকে (আল্লাহ না করুন) যেদিন মসজিদুল আকসা ভেঙ্গে পড়বে।

ইহুদী দাবীর ব্যাপারে চুল-চেরা বিশ্লেষণ

আমরা এখানে চুলচেরা আলোচনা করব তাদের পুরাতন যুগের গ্রন্থের দাবীর ব্যাপারে যাতে বলা হয়েছে যে, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে (আ.) ওয়াদা করেছিলেন, তিনি তার বংশধরকে ফিলিস্তীনের ভূমি দিবেন। তেমনিভাবে তাঁর পুত্র ইসহাক এবং তাঁর পৌত্র ইয়াকুব যার অপর নাম ইসরাইল ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং এর ভিত্তিতে তারা এই ভূমির নাম রেখেছে অঙ্গীকারের ভূমি।" আমরা এ ব্যাপারে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই ঃ

ইবরাহীমের বংশধর কারা?

প্রথমতঃ ইবরাহীমের বংশধর বলতে কাদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে? তারা কি তাঁর ঔরসজাত বংশধর নাকি তারা যারা তার আদর্শের (দীনের) সন্তান? অর্থাৎ যারা তাঁর ধর্মকে অনুসরণ করছে এবং তাঁর দেয়া পথে চলছে এবং তাঁর হেদায়েতের অনুসরণ করছে? কিন্তু তাঁর ঔরসজাত সন্তানরা তাদের পিতা ইবরাহীমের মত এক বিঘত জমিরও মালিক ছিল না। তাহলে কাদেরকে সন্তান বলে উল্লেখ করা হচ্ছে?

নবুওতের সনাতন পদ্ধতি যার দ্বারা ইবরাহীম (আ.) বিশেষ বৈশিষ্ট মন্ডিত হয়েছেন। সেই সনাতন পদ্ধতির যারা অনুসরণ করেছে, তাঁর ওপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর পথ অনুসরণ করেছে তারাই হল তাঁর নিকটতম লোক। কুরআন মজীদে এ কথাটিই অত্যন্ত জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

«اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا »۔ (آل عمران : ٦٨)

"মানুষের ভেতর ইবরাহীমের সাথে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কের বেশী অধিকারী তো তারাই, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী ও তার ওপর ঈমান আনয়নকারীরা। এরাই হচ্ছে ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৮)

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নেতৃত্ব ওয়ারিস সূত্রে স্থানান্তরিত হয় না এবং অত্যাচারীরা আল্লাহর অঙ্গীকারের হকদার নয়, কেননা আল্লাহর কাছে যা

রয়েছে তা পাওয়া যায় আমলের মাধ্যমে বংশের দ্বারা নয়। যেমন নবী করীম (সা.) বলেছেন "যার আমল তাকে ধীরগতি করে ফেলবে তাকে তার বংশ মর্যাদা দ্রুতগতি সম্পন্ন করাতে সক্ষম হবে না।"

হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন যখন প্রকাশ হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন। তেমনিভাবে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন তার কওম থেকে যখন তারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল। মহান আল্লাহ্ বলেন,

«قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ »۔(الممتحنة : ٤)

"তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম এবং তাঁর সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে। তারা তাদের কওমকে বলেছিল, আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত তোমরা কর, তা থেকে আমরা মুক্ত। আমরা তোমাদেরকে মানিনা এবং তোমাদের ও আমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকেই যাবে যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে ।" (সূরা মুমতাহানা ঃ ৪)

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন,

«وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ج فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ »۔(التوبة : ١١٤)

"ইবরাহীমের স্বীয় পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ছিল মূলত তার ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতেই যা সে ইতিপূর্বে করেছিল কিন্তু যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।" (সূরা তাওবা ঃ ১১৪)

ইসমাঈল কি ইবরাহীমের ঔরসজাত নয়?

দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি ধরে নেই যে, ইবরাহীমের বংশধর বলতে তার ঔরসজাত সন্তান বুঝায় তাহলে তার প্রথম সন্তান ইসমাঈল ও তার বংশধরকে কেন ইবরাহীমের বংশধর বলা হবে না? কেন আল্লাহ পক্ষাবলম্বন করবেন বনী ইসরাইলের দিকে, বনী ইসমাঈলের বিপক্ষে?

তাওরাতে (সাফারুত্ তাকভীন) বারটিরও বেশী স্থানে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ইসরাইলীরা বলে ইসমাঈল হল দাসী হাজেরার সন্তান আর ইসহাক হল স্বাধীন সারার সন্তান। কিন্তু তারা দু'জনই কি ইবরাহীমের সন্তান নয়? এবং দু'জনই কি আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী রসূল নন? কোন লোকের সন্তান কি মায়ের কারণে পিতার মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে?

এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, প্রশ্নটি করেছেন ড. হাস্সান হুতহুত– ইয়াকুবের ১৩ সন্তানের ব্যাপারে। তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইসরাইল তার দুই খালাত বোন রাহীল এবং লিয়াকে এবং তাদের দুই দাসী জালবা এবং বালহা কে বিয়ে করেন। এই দু' দাসীর গর্ভে ইসরাইলের ছয় সন্তান জন্ম নেয়। তারা কেন এদেরকে ইসরাইলের সন্তান বলে গণ্য করে? এদের সন্তান হতে সামান্য অনুপরমানুও ঘাটতি বা কমতি ধরে না? তারা এর কোন জবাব দিতে পারে না। বনী ইসরাইলীদের মাঝে দাসী বিয়ে অব্যাহত ছিল। পুরাতন যুগের আসফারে বর্ণিত হয়েছে যে, দাউদের ছিল একশ স্ত্রী এবং দু'শ দাসী, আর তার পুত্র সোলায়মানের ছিল তিনশ স্ত্রী এবং সাতশ দাসী। এ ব্যাপারে কোনই বিরোধ নেই যে, এসব দাসীরা দাউদ ও সোলায়মানের সন্তান জন্ম দিয়েছে। আর এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এসব দাসীর সন্তানরা বনী ইসরাইল। এ ব্যাপারে ইহুদীরা কি বলে?

আল্লাহর সুবিচার কোথায়?

তৃতীয়তঃ জুলুম হতে পারে আল্লাহ এমন কোন নির্দেশ দিতে পারেন না। কেননা, তিনি নিজের ওপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছেন এবং বান্দাদের ওপর তা হারাম করেছেন। যে জমিনের বৈধ মালিক রয়েছে, যারা সেখানে বসাবাস করে আসছে, তিনি কিভাবে এ জমি তাদেরকে দিবেন যারা এখানে জোর করে আসতে চায়, যারা বিদেশী। তাহলে আল্লাহর সুবিচার কোথায়? অথচ তিনি সুবিচারকারীদের ভালবাসেন আর অত্যাচারীদের ভালবাসেন না।

শর্তযুক্ত ওয়াদা, ইহুদীরা শর্ত পূর্ণ করেনি

চতুর্থতঃ জমীনের মালিকানা দেয়ার ব্যাপারে যে অঙ্গীকারের কথা বলা হচ্ছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে তা কি সাধারণ ওয়াদা, নাকি শর্তযুক্ত ওয়াদা? যদি শর্তযুক্ত হয় তাহলে শর্ত কি বাস্তবায়িত হয়েছে? যারাই খৃষ্টানদের কিতাব পাঠ করবে বিশেষ করে 'পুরাতন যুগ' অংশ, তাতে পাবে যে, বনী ইসরাইলকে দেয়া আল্লাহর ওয়াদা শর্তযুক্ত, যেন তারা তাওরাতের শিক্ষা বাস্তবায়ন করে, ওয়াদা রক্ষা করে এবং প্রভুর নির্দেশ ও নিষেধ সংরক্ষণ করে তবেই তারা আল্লাহর সাহায্য পাবার উপযোগী হবে। আর এটিই হচ্ছে বাস্তব সম্মত ও বিবেক সম্মত কথা যে আল্লাহ্ তাঁর বিধি মত ইনসাফ করবেন। আল্লাহ্ মানুষকে তার বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে প্রতিদান দেন না, বরং প্রতিদান দেন আমলের ভিত্তিতে।

ইহুদীরা প্রভুর ওয়াদা ভঙ্গ করেছে

মুহাম্মদ আবু ফারেস এ প্রমাণপঞ্জি উদ্ধৃত করেছেনঃ

"তোমরা তোমাদের মাবুদ প্রভুর নির্দেশ, শাহাদাত এবং ফরজ সমূহের হেফাজত কর যা তিনি তোমাদের আদিষ্ট করেছেন।" (তাসনিয়া/৬ঃ১৮)

"তুমি সৎ ও উত্তম আমল কর, প্রভুর দু'চোখের সামনে। যেন তোমারই কল্যাণ হয় এবং প্রবেশ করবে ও মালিক হবে উত্তম ভূমির যা রেখেছেন প্রভু তোমার বাপ দাদাদের জন্য।" (তাসনিয়া/৬ঃ১৮)

"তোমরা উপদেশাবলী, ফরজসমূহ এবং বিধিবিধান সংরক্ষণ কর যা আমি আজ তোমাকে শিক্ষা করার জন্য উপদেশ দিচ্ছি।" (তাসনিয়া/৭ঃ ১১)

এই তিনটি দলীল সাফারুত্ তাসনীয়া (পূরাতন যুগ) শর্তের ব্যাখ্যা করেছে এবং মৌলনীতি বর্ণনা করেছে যা প্রভু বনী ইসরাইলকে অঙ্গীকার দেয়ার জন্য নির্ধারণ করেছেন।

কিন্তু .... তারা কি তা পালন করেছে? ..... তারা কি তার প্রভুর নির্দেশ সংরক্ষণ করেছে?

খৃষ্টানদের ধারণা মতে তাদের নিকট যেটি আছে সেই পবিত্র গ্রন্থের লিখাগুলো খোদার দেয়া বাণী। এর অনুসরণ করা হল প্রভুর নির্দেশের আনুগত্য করা। লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ঃ

প্রথমত- তাদেরকে হারুন বললেন, তোমরা স্বর্ণের অলংকার খুলে ফেল যা তোমাদের মহিলা, ছেলে এবং মেয়েদের কানে রয়েছে এবং তারা তা কান থেকে খুলে হারুনের নিকট নিয়ে আসে। তখন তিনি সেগুলো তাদের হাত থেকে নেন এবং তা দিয়ে স্বর্ণের গো বাচ্চা তৈরী করেন। (সাফারুল খুরুজ /৩২ঃ ২-৩-৪) (কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাইলের জন্য স্বর্ণের গো বাছুর তৈরী করেছিল সামের। আর হারুন তাদের এই কর্মের বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু তারা তার কথা শোনেনি। (সূরা তা-হা, ৮৫-৯৮) তাতে উল্লেখ রয়েছে ইতিপুর্বে হারুন তাদেরকে বলেছিল তোমরা এর দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছো আর তোমাদের প্রভু অতীব দয়াবান। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার নির্দেশের আনুগত্য কর। তারা বলল, আমরা মুসা না ফিরে আসা পর্যন্ত এর সামনেই অবস্থান করব। তারা বলল, হে ইসরাইল! এটিই কি তোমার প্রভু? যে তোমাকে মিসরের মাটি থেকে এনে সৌভাগ্যশালী করেছেন।" বনী ইসরাইলরা এক আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তি পূজা করেছে যা তাদের মাঝে ও অঙ্গীকারের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবেই তারা পৌত্তলিকতার দিকে ফিরে যায় এবং -তাদের ধারনা মতে- হারুনের নেতৃত্বে তারা অঙ্গীকারের মূল শর্ত ভঙ্গ করেছে।

দ্বিতীয়ত- এর বহুদিন পর ইলিয়া (ইলিয়াস) নবী প্রভুকে এ বাক্যাবলী দ্বারা আহবান করেঃ .... কেননা বনী ইসরাইলরা অঙ্গীকার পরিত্যাগ করে এবং তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে। আর তোমার নবীদেরকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেছো। তারা আমাকেও হত্যা করতে চায়।" (রাজা/৯ঃ ১০)

তৃতীয়ত- মুসা নবী স্বয়ং (অর্থাৎ নবী ইলিয়ারও আগে) বলেছিলেন ঃ তাসনিয়া/৯ঃ২৩-২৪ঃ মুসা বলেন, তোমরা তোমাদের মাবুদ প্রভুর অবাধ্যতা করেছো এবং তাকে বিশ্বাস করনি এবং তার কথাও শোননি। আমি যতদিন থেকে তোমাদেরকে জানি, তোমরা প্রভুর অবাধ্যতা করেই যাচ্ছ।

চতুর্থত- স্বয়ং প্রভু ইশুয়াকে বলেন, বনী ইসরাইলরা ভুল করেছে, তারা আমার ওয়াদার বিরুদ্ধাচারণ করেছে যা তাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম এবং তারা হারামকে গ্রহণ করেছে। তারা চুরি করেছে এবং তারা অস্বীকার করেছে ...।" (ইয়াশুয়া ঃ ৭ঃ১১)

বি. দ্র. **ইসরাইলীরা ভুল করেছে–** এর অর্থ তারা অপরাধ করেছে।

পঞ্চমত- নাহমীয়া বনী ইসরাইলকে এ বলে সম্বোধন করেন ঃ সত্যিই একজন মহিলা যেমন তার স্বামীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তেমনিভাবে তোমরা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, হে ইসরাইলের বশংবদরা। (নাহমীয়া/৩ঃ২০)

ষষ্ঠত- মুসা (আ.) বনী ইসরাইলকে যেভাবে সম্বোধন করেছিলেন আমরা তার পুনঃ উল্লেখ করছি ঃ মুসা বনী ইসরাইল বললেন, তোমরাতো তারাই যারা তোমাদের পিতার প্রশিক্ষণকে ভুল ভাবে মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছ যেন আবার তোমাদের প্রভুর বেশী বেশী ক্রোধ ডেকে আনো বনী ইসরাইলের ওপর। (সংখ্যা/ ৩২ঃ ১৪)

সপ্তমত- শোন হে ইয়াকুব পরিবারের প্রধানগণ এবং ইয়াকুব পরিবারের বিচারকগণ যারা সত্যকে ঘৃণা করছ এবং প্রতিটি সহজ সরল জিনিসকে বাঁকা করছো, যারা সায়হান নদীকে রক্তে এবং ওরশলীমকে অত্যাচারে ভরে দিয়েছো। এর প্রধানরা ঘুষ খাচ্ছো, গণকেরা পয়সার বিনিময়ে শিক্ষাদান করছো এবং তোমাদের নবীদেরকে চেনা যাচ্ছে রৌপ্য দ্বারা ....। (মিখা/৩ ঃ ৯-১০-১১)

আমরা এই সাতটি উদাহরণ 'পুরাতন যুগ' থেকে উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি, এতেই বনী ইসরাইলের আনুগত্য ও শর্ত মেনে চলার নমুনা উন্মোচন করছে। তারা যে অঙ্গীকারের কথা বলে, যা তাদের প্রভু ইবরাহীম এবং অতপর ইসহাক ও ইয়াকুবের সাথে করেছিলেন।

তেমনি নতুন যুগের পবিত্র কিতাবেও এমন প্রমাণাদি পাওয়া যায় যা তাদের কথিত অঙ্গীকারের ব্যাপারে তাদের স্বভাব চরিত্রই তুলে ধরেছে।

প্রথমতঃ ইয়াসু মসীহ ইসরাইলীদের লক্ষ্য করে এ বক্তব্য প্রদান করেন-

তাদেরকে ইয়াসু বললেন, তোমাদেরকে আমি বলছি ওশারিন ও জাওয়ানিরা আল্লাহর রাজ্যে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। কেননা তোমাদের নিকট সত্য পথ নিয়ে ইউহান্না এসেছিল কিন্তু তোমরা ঈমান আননি। এজন্য তোমাদেরকে বলি, আল্লাহর রাজ্য তোমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং দেয়া হবে এমন জাতিকে যারা তোমাদের পরে ভাল কাজ করবে। (মথি/২১ঃ ৩১ঃ ৪৩)

দ্বিতীয়তঃ ইউহান্না আলমাদান এভাবে বনী ইসরাইলকে সম্বোধন করে বলেন, "হে অজগরের সন্তানেরা।" (মথি/৩ঃ ৭)

তৃতীয়তঃ স্বয়ং ইয়াসু বনী ইসরাইলদের বলেন, তোমরা নিজেরাই তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, তোমরা নবীদের হত্যাকারীর সন্তান। হে সাপেরা, অজগরের সন্তানরা! তোমরা কিভাবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পালাবে। (মথি/ ২৩ঃ ৩১-৩২-৩৩)

এভাবেই .... তাদের পবিত্র গ্রন্থ থেকেই তাওরাতের বাণী হুবহু উদ্ধৃত করলাম যা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুসা ইউশা অতপর ইলিয়া, আরমিয়া, আজরা নাহমিয়া, ইউহান্না এবং সর্বশেষ ইয়াসু মসীহ এর যুগে তারা সব সময় প্রধান শর্তসমূহকে ভঙ্গ করেছে। তারা তাদের অঙ্গীকার পাবার জন্য মৌলিক শর্ত যা আল্লাহ ও ইবরাহীমের মাঝে হয়েছিল তা ভঙ্গ করেছে। তারা এ শর্তাবলী বিভিন্ন সময়ে ও যুগে বার বার ভঙ্গ করেছে, আর এতে যেসব প্রশ্ন জাগে।

তা হল ঃ এই শর্তভঙ্গের পরও কি এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তাদের তাওরাতের ওয়াদা এমন এক দেশে ঠিক রয়েছে যা স্বাধীন এবং যেখানে সেখানকার অধিবাসীরা বিদ্যমান। যেমন ফিলিস্তীন, লেবানন ও সিরিয়া, মিসর ও জর্ডান, সে সব জাতির জন্য যেমন ফালাশা ইথিওপীয় বা রাশিয়ান, ইউক্রেনীয়, আমেরিকান, আর্জেন্টিনীয় ইত্যাদি, যারা বার বার ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। এরপরও কি এটা ইনসাফের কথা যে, তারা তাদের অঙ্গীকারের প্রতিশ্রুতি দাবী করবে? (দেখুন, ফিলিস্তীনে কি ইহুদীদের জন্য তাওরাতের অঙ্গীকার রয়েছে? মুহাম্মাদ আহমদ আবু ফারেস, পৃ. ৩১,৩২)

কুরআনের ভাষ্য জমিনের উত্তরাধিকারী হবে সৎলোকেরা

কুরআনের ভাষ্য হল ঃ মহান আল্লাহ এই জমিনের কর্তৃত্ব দেন তার নেককার বান্দাদের হাতে। কোন জাতি-গোষ্ঠীর লোকদের হাতে নয়। কেননা মহান আল্লাহ কোন মানুষের সাথে তার বংশ মর্যাদা বা জাতীয়তার ভিত্তিতে বিচার করেন না। বরং বিবেচ্য হল তার আমল, ঈমান এবং খোদাভীতি। **"নিশ্চয় তোমাদের নিকট সে-ই সবচেয়ে আল্লাহর নিকট সম্মানিত**, যে তোমাদের **মধ্যে সবচেয়ে খোদাভীরু।"** (সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

মহান আল্লাহ বলেন, **"আমরা যবুর কিতাবে তাদের** উপদেশ দেয়ার পর

নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এই জমিনের উত্তরাধিকারী হবে আমার নেককার বান্দারা।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ১০৫)

সুতরাং নেককার বান্দা যারা তারাই এই জমিনের কর্তৃত্ব পাবে সে সবের মধ্যে থেকে যারা অবাধ্য হয়েছিল বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, অত্যাচার করেছিল এবং নবী রসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তাদেরকে কষ্ট দিয়েছিল এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছিল। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا ط فَاَوْحَى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ - وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ط ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىْ وَخَافَ وَعِيْدِ »- (ابراهيم : ١٣-١٤)

"কাফেররা তাদের রাসূলদেরকে বলেছিল, তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দিব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। অতঃপর তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে ওহী নাজিল করা হয় যে, আমরা অবশ্যই জালেমদেরকে ধ্বংস করব এবং তাদের পরে তোমাদেরকে জমিনে বসবাস করতে দিব। এটা তাদের জন্য যারা আমার মর্যাদাকে এবং ওয়াদাকে ভয় করবে। " (সূরা ইবরাহীম ঃ ১৩-১৪)

ইসলামী উম্মতই হল উপযুক্ত উম্মত। হযরত ইবরাহিম (আ.) এর নিকট আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন, তাদের এ ভূমির উত্তরাধিকারী করবেন। যদি এই ওহী সঠিক হয় তবে তারা হল ইসমাইল বিন ইবরাহীম এর বংশধর। বরং তারা হল তার অধিক নৈকট্য লাভকারী এবং তার দ্বীনের অনুসরণকারী। তারা এই ভূমির উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এর হক প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে বিগত ১৪ চৌদ্দশ বছর ধরে। তারাই এই ভূমির মালিক ও এর অধিবাসী । তারা সেখানেই অবশিষ্ট রয়েছে (আল্লাহর ইচ্ছায়) যতদিন না আল্লাহ এই জমিনকে ধ্বংস না করেন। এই জমিনের ওপর তাদের উপস্থিতিই হচ্ছে আইনগত একমাত্র সঠিক ও বৈধ উপস্থিতি যাকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মুমিনগণ এবং প্রতিটি ন্যায়বান বান্দা সমর্থন করেন। কিন্তু যায়নবাদীদের উপস্থিতি হচ্ছে জবরদখল, সীমালংঘন, অন্যায় ও অবৈধ উপস্থিতি। এটি স্থায়ী হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এটি অবশ্যই ধ্বংস হবে। মহান প্রভূ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ নন। "আর জালেমরা অবশ্যই জানতে পারবে যে, তাদের ওপর কি গজব এসে পড়বে।" (শুয়ারা ঃ ২২৭)

আমাদের শত্রুকে চিনেছি কি?

যে ব্যক্তিই কোন শত্রুর সাথে লড়াই করবে, তাকে অবশ্যাই শত্রুর প্রকৃতি জানতে হবে; তার মূল ও শিকড়, তার ব্যক্তিত্বের ধরন, স্বভাব চরিত্র, আশা আকাংখা এবং লোভ-লালসা সম্পর্কে এবং সে কি চিন্তা করে, কি পরিকল্পনা আটছে, কিভাবে তা বাস্তবায়ন করতে চায়, কার কাছ থেকে সাহায্য সহায়তা নিচ্ছে এবং কি কি পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করছে, তার কাছে কি কি অস্ত্রপাতি আছে আর কি নেই? কোন কোন উপাদানে তার জাতি ঐক্যবদ্ধ ও কোন বিষয়ে বিভক্ত? কিসে তাকে নাড়াচ্ছে আর কোন জিনিস তাকে স্থির করছে? সে কি কি মৌলিক উপকরণের অধিকারী এবং সে বাইরে থেকে আর কি কি সাহায্য পেতে পারে ..... ইত্যাদি যা দ্বারা সে শত্রুর স্বরূপ উন্মোচন করতে পারবে। জানতে পারবে আসলে সে কি ধরনের শক্তি রাখে বা তার দুর্বলতা কোথায়?

আধুনিক রাষ্ট্রগুলো তার জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নে, গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক তথ্য সংস্থাগুলোর মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা চালায় তার শত্রুর সম্পর্কে জানতে। ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, জনবল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্পর্কে পূঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র যাতে ফোটে ওঠে।

আমরা জানি যে, ইসরাইলের পিছনে সাহায্যকারী হিসাবে আছে পশ্চিমা শক্তি, বিশেষ করে আমেরিকা। সে আমাদের সব কিছু উন্মুক্ত করে ছেড়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের সম্পর্কে যতটুকু না জানি আমেরিকা তার চেয়েও বেশী জানে। তাদের কাছে এমন মাধ্যম ও যন্ত্র-পাতি রয়েছে যা দ্বারা খুব সহজেই সবকিছু জানতে পারে। বিশেষ করে এই পরাশক্তির কাছে যত তথ্য রয়েছে তা সবই নিঃসন্দেহে ইসরাইলের। অর্থাৎ ইসরাইলের সহায়ক শক্তি।

অথচ আমরা কি শত্রুকে চিনতে পেরেছি? যাকে চিনার মাধ্যম আমাদের দ্বীন, আমাদের দুনিয়া (স্বার্থ) ও আমাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করেছে?

আমাদের শত্রুকে জানার মৌলিক উৎস ঃ

প্রকৃত পক্ষে আমরা এই কঠিন বর্বর শত্রুর সাথে সঠিক আচরণ করতে জানিনা, যেমনটি করা উচিত।

আমরা শত্রুর সাথে যথার্থ আচরণ করতে জানিনা, কেননা আমরা তাদের শক্তির উৎস সম্পর্কে জানিনা। জানতে পারলে তার শক্তির চেয়েও বেশী শক্তি দিয়ে তাকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসতে পারতাম। আমরা তাদের দুর্বলতার কেন্দ্রগুলোও জানিনা যে, সেখানে আঘাত করব। কেননা আমরা সত্যিকার অর্থে শত্রুর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট, শক্তি-সামর্থ এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানি না। আমরা এর উপর প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান সম্পর্কেও গবেষণা চালাইনি। এ কথা জানতে, কিভাবে সে চিন্তা করছে, কিভাবে পরিকল্পনা আটছে এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন করছে এবং জানিনা সে কি চায় এবং সে যা চায় তাতে কিভাবে পৌছবে। হয়তবা কিছু কিছু বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যা ইতিপূর্বে অজানা ছিল কিন্তু আমরা সে অবস্থানে পৌছতে সক্ষম হব না যেখানে পৌছা জরুরী ছিল শত্রুকে চিনার ও জানার জন্য।

আমাদের পক্ষে এটা খুবই সহজসাধ্য ও সম্ভব ছিল যে কতিপয় উৎসের মাধ্যমে আমরা অতি সহজেই শত্রুকে ও তার প্রকৃতিকে জানতে ও চিনতে পারতাম। এসব উৎস হল ঃ

প্রথম উৎস– কুরআন মজীদ ঃ

কুরআন মজীদে বনী ইসরাইলদের সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতে তাদের স্বভাব চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এবং মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্টকে উন্মোচন করা হয়েছে যা তারা পৈত্রিক সূত্রে পেয়েছে। এসব যেন তাদের স্থায়ী স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। আমরা সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা আ'রাফ এবং সূরা ইসরা'য় (যার অপর নাম 'বনী ইসরাঈল') এ সম্পর্কে উল্লেখ দেখতে পাই।

কুরআন তাদেরকে বিশেষিত করেছে কাঠিন্য ও ভীরুতা দ্বারা এবং একই সাথে হিংসুক ও বিরুদ্ধবাদী বলে। তাদেরকে আবার ওয়াদাভঙ্গকারী ও

গাদ্দারও বলেছে। সাথে সাথে কুরআন বলছে তারা আল্লাহর রাসূলের ওপর বাড়াবাড়িকারী। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য সকলের মালামাল ও ইজ্জত-আব্রুর জবর দখল ও ভোগকারী, সে কথাও কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

আমরা মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীসমূহে দেখতে পাই ঃ

«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً »۔(البقرة : ٧٤)

"অতপর তোমাদের অন্তঃকরণ কঠোর হয়ে যায়। এটি পাথরের মত অথবা তার চেয়েও শক্ত।" (সূরা বাকারা ঃ ৭৪)

বিংশ শতকে তাদের এই কঠোরতা ফুটে উঠে দীরে ইয়াসীন ও শাবরা ও শাতিলা উদ্বাস্তু শিবিরে ও অন্যান্য স্থানে (যেখানে হাজার হাজার নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিচারে নিরাপরাধ লোকজনকে তারা হত্যা করে।)

মহান আল্লাহ বলেন,

«فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً »۔

"তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে তাদের ওপর অভিসম্পাত করি এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দেই।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

«اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لاَ يَتَّقُوْنَ »۔(الانفال : ٥٦)

"যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন তারা প্রত্যেকবারই চুক্তি ভঙ্গ করেছে। তারা কোন কিছুই ভয় করে না।" (সূরা আনফাল ঃ ৫৬)

বাস্তব অবস্থাও কুরআনের বক্তব্যকে সত্য বলে প্রমাণিত করছে যে তারা কত চুক্তি ও ওয়াদা ভঙ্গ করেছে এবং মহান আল্লাহর এ বাণী ঃ

«لاَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلاَّ فِيْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ط تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ »۔(الحشر : ١٤)

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্রে কেবল নিরাপদ গ্রামে (দুর্গে) অথবা দেয়ালের পিছন থেকে লড়াই করবে তাদের নিজেদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব। তাদেরকে তোমরা ঐক্যবদ্ধ মনে কর কিন্তু বাস্তবে তারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত। (সূরা হাশর ঃ ১৪) তারা জানের ভয়ে সামনা সামনি যুদ্ধ করে না। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

«وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلٰى حَيٰوةٍ»- (البقرة : ٩٦)

"তাদেরকে তোমরা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উদগ্রীব পাবে।" (সূরা বাকারা ঃ ৯৬)

তারা লুকাবে দেয়ালের পিছনে, দুর্গের ভিতরে ..... তারা নিজেদের মধ্যে চরম বিভক্তি ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত কিন্তু তারা তা মিটাতে (Overcome) সমর্থ, যার ফলে অন্যরা বাইরে থেকে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ বলে মনে করে যদিও তাদের বিভিন্ন রকমের মত রয়েছে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পারস্পরিক ভিন্নতর।

মহান আল্লাহ বলেন,

«لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ»-

"আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন যারা বলে আল্লাহ ফকীর আর আমরা ধনী। তারা যা বলে তা অবশ্যই আমরা লিখে রাখব এবং তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮১)

এটিই প্রমাণ করে তাদের বাড়াবাড়ি, ঔদ্ধত্য এবং সৌজন্য বোধের ঘাটতির এমনকি মহান আল্লাহর সাথে।

মহান প্রভু বলেন,

«ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْا اِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ»- (آل عمران : ١١٢)

“তাদের ওপর অপমান ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন একমাত্র আল্লাহর ছত্রছায়া এবং মানুষের ছত্রছায়া ব্যতীত। তারা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হল এবং তাদের ওপর .... মেরে দেয়া হল কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারা অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছিল।” (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১২)

এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, তাদের ওপর লাঞ্ছনা ও অপমান চেপেই থাকবে যেখানেই তারা থাকুক না কেন তবে এ থেকে বেঁচে যাবে যদি আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে এবং সত্যিকার ঈমান আনে অথবা এমন মানুষের ছত্রছায়ায় থাকে যারা তাদেরকে রক্ষা করবে যেমন আজকে আমেরিকানরা করছে। এটা তাদের কুফরী ও আল্লাহর নবীদেরকে হত্যার শাস্তি স্বরূপ এবং ক্রমাগত তাদের অবাধ্যতা ও বিদ্বেষের প্রতিদান স্বরূপ।

«وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لاَّ يُؤَدِّهٖ اِلَيْكَ الاَّ مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الاُمِّيّنَ سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ» (آل عمران : ٧٥)

“তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোকও রয়েছে যাদেরকে এক দিনার আমানত দিলে সেটাও ফেরত দিবে না যদি না তুমি এর ব্যাপারে সঠিক ভাবে না থাকতে পার। কেননা তারা বলে এসব নিরক্ষরদের জন্য আমাদের ওপর কোনই পথ নেই এবং তারা আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করে অথচ তারা তা জানে।” (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৫)

এহল আরব ও অন্যান্য জাতির ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যে, যদি তাদের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে নেয় কোন অসুবিধে নেই, তাদের বাড়িঘর দখল করে নেয় এবং তাদের ইজ্জত আব্রু হালাল করে নেয়। কেননা নিরক্ষরদের ওপর তাদের কোনই দায়িত্ব নেই। কুরআন তাদেরকে আত্ম-অহংকারী এবং দাম্ভিক বলে অভিহিত করা হয়েছে। **“তারা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তার প্রিয় পাত্র।”** (মায়েদা ঃ ১৮)

কুরআন তাদের একথা প্রত্যাখান করে বলে, **“বলুন তাহলে কেন তোমাদেরকে তোমাদের অপরাধের কারণে শাস্তি দেয়া হল, বরং তোমরা**

অন্যান্য মানুষের মত সৃষ্টি।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৮) **"তারা বলে আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন মাত্র কয়েক দিনই স্পর্শ করবে।"** (সূরা বাকারা ঃ ৮০)

কুরআন তাদের এ দাবী প্রত্যাখান করে বলে,

«قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ »- (البقرة : ٨٠)

"বলুন, তোমরা কি এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছো? আল্লাহ্ কখনো তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে এমন কথা বলছো যা তোমরা জাননা।" (সূরা বাকারা ঃ ৮০)

কুরআন তাদেরকে এভাবে চিত্রিত করেছে যে, এরা এমন-সম্প্রদায় যারা শক্তি ছাড়া কারো কাছে নতি স্বীকার করে না। এমনকি আল্লাহ্ আদেশ ও নিষেধকে পর্যন্ত মানতে চায় না যতক্ষণ না তাদের ওপর কোন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে আনুগত্যে বাধ্য করানো হয়। এ ব্যাপারে কুরআন বলে,

«وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوْا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ »-

"স্মরণ করুন সে সময়ের কথা যখন আমি তাদের ওপর পাহাড় তুলে ধরলাম যেন তা তাদের উপরে মেঘের মত এবং তারা ধারনা করল যে, তা তাদের ওপর আছড়ে পড়বে। আমি বললাম, যা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তা শক্ত করে ধর এবং তাতে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে তা স্মরণ কর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭১)

এ জাতির ব্যাপারে কুরআন অনেক কথা বলেছে। এ ব্যাপারে পূর্বের এবং বর্তমানের লেখা কুরআনের তাফসীর গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে। এ বিষয়ের ওপর বিশেষ বইও লেখা হয়েছে। (যেমন কুরআন ও সুন্নায় বনী ইসরাইল, ড. মুহাম্মদ সাইয়েদ তানতাবী; কুরআনে ইহুদীরা, আফীফ তবারা।) পূর্বের যুগের কতিপয় মুফাসসীর বলেন, মনে হয় কুরআন যেন মুসা ও বনী ইসরাইলদের। বনী ইসরাঈলদের ঘটনাবলী অত্যধিক উল্লেখ হবার কারণেই তারা একথা বলেছেন।

দ্বিতীয় উৎস- তাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহ ঃ

দ্বিতীয়ত ঃ তাদের নিজেদের পবিত্র গ্রন্থ সমূহ, যেমন তাওরাতে বলা হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় জাতি এবং তাদের এ অধিকার রয়েছে যে, তারা কোন জনপদে প্রবেশ করলে তার সবই অধিকার করে নিতে পারবে।

নবীদের সফর ঃ হাজ্‌ফীয়াল, আশিয়া ও অন্যান্য গ্রন্থে তাদেরকে মানসিকভাবে তৈরী করেছে ভূমিতে ফিরে আসার জন্য যা তাদের তিনটি মৌলিক বিষয়ের একটি ঃ প্রভূ, জাতি এবং ভূমি। আর তালমুদে তাদেরকে সমস্ত জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে এবং তাদের জন্য অন্যান্য জাতির রক্ত, সম্পদ ও ইজ্জত-আব্রুকে হালাল করে দিয়েছে। এজন্য তারা সব রকমের উপায় উপকরণ ব্যবহার করবে তা যতই নিকৃষ্ট হোকনা কেন। তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এটা তাদের জন্য মর্যাদাকর ও বৈধ। তাদের কিতাবাদি তাদের গুনাবলীতে ভরপুর এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে ভৎসনা করা হয়েছে তাদের অবস্থান ও চরিত্রের ব্যাপারেও। যে কেউ এসব পড়বে সে আশ্চর্যান্বিত হবে আল্লাহ ও রসূলদের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ দেখে। উদাহরণ স্বরূপ এসব দলিল পড়া যায়ঃ

তাওরাত বলছে সাফারুত্ তাসনিয়া ঃ (৩২, ৩৩) এসব লোকদের ব্যাপারে ঃ এরা বক্র, কু-চক্র গোষ্ঠী। প্রভূ একথা বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, হে নিরেট জাতি, বুদ্ধিমান নও। দেখুন তাদের শেষ পরিণতি কেমন হয়? এরা হল ডিগবাজী খাওয়া প্রজন্ম। এমন সন্তান যাদের ভিতর আমানত নেই।

"এরা হল বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীহীন জাতি।"

তাদের নবী মুসা তাদেরকে বলেন, তিনি তাদের দ্বারা পুরোপুরি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন, আমি অবশ্যই তোমাদের বিদ্রোহ সম্পর্কে অবহিত এবং তোমাদের ঘাড় টেড়া সম্পর্কে। আমি জীবিত থাকা অবস্থায় আজ তোমরা তোমাদের প্রভুর বিরুদ্ধাচারন করছ তাহলে আমার মৃত্যুর পর যে কি করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরপর অনেক অনেক বিদ্রোহ করবে।

তৃতীয় উৎস- ইতিহাস ঃ

ইতিহাস হল উপদেশের খনি, জাতি সমূহের শিক্ষক। ইতিহাস আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, ইহুদীরা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মাঝে বসবাস করেছে পরগাছার মত। সে তাদের কাছ থেকে নেবে কিন্তু দেবে না সে অন্যের ধ্বংসস্তুপের ওপর নিজের প্রাসাদ গড়বে। এরা হল চরম স্বার্থপর নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বুঝে না। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে বিশ্বাস করে না। নিজেদের স্বার্থ ছাড়া এক পাও তুলে না। আর নৈতিকতা, ভদ্রতা শিষ্টাচার যা মানুষ সম্মানের সাথে দেখে থাকে এরা এ সবের সামান্যতমও ধার ধারেনা কেবলমাত্র যদি এর দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি হয় নতুবা এসব তাদের পায়ের তলায়। যারাই ইহুদী ইতিহাস পড়েছে বা বনী ইসরাইল সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে তাদের পবিত্র সফরনামা তার নিকট এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে দিবালোকের মত। যেমনটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন উস্তাদ মুহাম্মদ ইজ্জত দরুজা তার "সফর নামায় বনী ইসরাইলের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে। যারাই তাদের সাথে আমাদের ইতিহাস এবং আমাদের সাথে তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছে তারাই ভালভাবে জানতে পারবে যে, গন্ডগোলের পিছনে তারাই রয়েছে এবং প্রতিটি বিপদের উৎস তারাই। এমনকি কেউ কেউ বলেন, ফুটুস ফাটুশ পর্যন্তও ইহুদীদের থেকে।

চতুর্থ উৎস- তাদের সম্পর্কে বর্তমান লেখকদের লেখনী ঃ

তাদের সম্পর্কে ও তাদের আকাংখা সম্পর্কে, যায়নবাদ ও বিপজ্জনকতার সম্পর্কে ইহুদীদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বর্তমানের লেখকদের অনেক লেখা রয়েছে। এসব লেখক বলতে আরব ও মুসলমান লেখক বুঝাচ্ছি না বরং পশ্চিমা লেখকদের বুঝাচ্ছি, যারা তাদের রাষ্ট্র জন্ম দেয়ার জন্য পরিবেশ তৈরী করেছিল এবং সব ধরনের শক্তি দিয়ে তাকে বলিয়ান করে তুলেছে, ফলে তারা বাড়াবাড়ি ও ঔদ্ধত্ব দেখিয়েছে এবং সীমালংঘন করেছে।

সর্বশেষ তাদের ব্যাপারে লিখেছেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী যাকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন যার ফলে তিনি মার্কসবাদ ও খৃষ্টান থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেছেন- রুজেহ জারুদী। তিনি তাঁর "যায়নবাদের স্বপ্ন ও তার ভ্রান্তি" নামক গ্রন্থে।

একথা সঠিক যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর বইটি প্রকাশিত হয় কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই এটি লিখেছিলেন। এ লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের স্বপ্ন-আশা-বাসনা এবং তাদের চিন্তাধারা ও অনুভূতি– যা তার দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার ফসল। তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক কল্প কাহিনী' রচনা করেন যা বিশ্বব্যাপী যায়নবাদকে নাড়া দেয় ও ক্ষুব্ধ করে তুলে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে তার দেশ ফ্রান্সে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার বিরুদ্ধে দন্ডাদেশ দেয়া হয়।

বর্তমান লেখনীর ব্যাপারে একটা বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হচ্ছে যে, আমরা যেন অজান্তেই এর বেড়াজালে আটকে না পড়ি আর তা হলো ইহুদীদের শক্তি ও চক্রান্তকে খুব বড় করে না দেখি। যেমনটি বিরাট করে তুলে ধরেছে এসব গ্রন্থে 'দুনিয়া ইসরাইলের হাতের পুতুল, 'দাবার গুটি' ইত্যাদি। এসব শেষ পর্যন্ত একে অপ্রতিরোধ্য রাজনীতিতে রূপান্তরিত করে, বাস্তব অবস্থাকে মেনে নেয়ার আহবান জানায় এবং গোপন শক্তির কাছে আত্ম সমর্পন করার যে শক্তি বিশ্ব পরিচালনা করছে। তাহলে আমাদের দুর্বলদের অবস্থা কেমন হবে?

পঞ্চম উৎস- ইহুদীদের বাস্তব জীবন ধারণ ঃ

এটি হল তাদের সাথে আমাদের সহাবস্থানের বর্তমান অবস্থা। এ গ্রন্থের সব অধ্যায় এখনো শেষ হয়নি। এরা এতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্যারা, অধ্যায় বা খন্ড সংযোজন করে চলেছে আর এ ব্যাপারে আমরা অজ্ঞ এবং অসচেতন রয়েছি। এরা আমাদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধে মোকাবেলা করেছে। আমরা তাদের সাথে অনেকগুলো চুক্তি ও যুদ্ধবিরতি স্থাপন করেছি এবং আমরা তাদের সাথে আলোচনায় বসেছি। আমরা তাদের সাথে সম্বোধন করেছি কথা ও অস্ত্রের ভাষায়। আমরা এ বাস্তবতাকে জেনেছি যে, এরা শক্তির জোরে ভূমি কেড়ে নিয়েছে তার মালিকদের নিকট থেকে এবং শক্তির দ্বারা জাতীয় রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছে। আর শক্তির দ্বারাই তাদের রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রেখেছে এবং শক্তির দ্বারাই এর সাথে নতুন নতুন ভূমি সংযুক্ত করছে ঃ গোলান, কুদস এবং পশ্চিম তীর।

ইতিপূর্বে শক্তি দ্বারা সে লেবাননে আক্রমন চালায় এবং তা ঘটে গোটা বিশ্বের মুসলমান আরব অনাবর সবার চোখের সামনে এবং শক্তি দ্বারাই

ফিলিস্তিনী যোদ্ধাদের বৈরুত থেকে বের করার তাদের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করেছে, যার ফলে তারা বের হতে বাধ্য হয়েছে। এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে দিবালোকে নিরস্ত্র, নিরাপরাধ ফিলিস্তিনীদের উদ্বাস্তুশিবিরে হত্যা করেছে। সে আরো যুদ্ধ বা হত্যাকান্ড চালাবার প্রস্তুতি নিয়েই যাচ্ছে। সর্বশেষ যে খবর শুনলাম যখন আমি এ লেখা লিখছি (১৯/১০/১৯৮২ খৃষ্টাব্দ) যা ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মেনাহিম বেগীন এক সীনাগগ (ইহুদী উপাসনালয়) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শান্তি আলোচনার আর কোন প্রয়োজন নেই যেহেতু অদূর ভবিষ্যতে ইসরাইল ও তার প্রতিবেশীদের মাঝে কোন শক্ত সংঘাত বাধার সম্ভাবনা নেই।

তিনি আরো বলেন, এজন্য প্রশ্ন এসে যায় কেন আমরা বর্তমান শান্তি কাঠামোকে ভেঙ্গে ফেলবো? এবং কেন আমরা নতুন নতুন শর্ত জুড়ে দিচ্ছি, যাতে আবার নতুন করে যুদ্ধ বেধে যেতে পারে এবং রক্ত ক্ষয় হয়।

এর অর্থ পরিষ্কার যে, লড়াই বাধাতে আরবদের ব্যর্থতা রয়েছে অথচ এই যুদ্ধই একমাত্র ইসরাইলের নিরাপত্তার হুমকি হতে পারে? এর অর্থ এই যে, বেগীনের দৃষ্টিতে সামরিক শক্তিই হল মূল ভীতি। এটিই ফায়সালাকারী। এটিই বিচার "তরবারী কথা বলেছে, সুতরাং কলম তুমি চুপ কর।"

বাস্তবতাবাদী বেগীন তার কথাকে শর্তযুক্ত করেছে কোন পরিবর্তন না করে। যেন সে ঘুমন্তদের জাগাতে বা বিচ্ছিন্নদের একত্রিত করতে বা উদভ্রান্তদের পরিকল্পিত পন্থায় আনার চেষ্টা করছে কিংবা দ্বিধাগ্রস্থদের আগে বাড়াতে চাচ্ছে আর বসে বসে আমাদেরকে কাজে লাগাতে চাচ্ছে।

আমাদের বর্তমান শত্রুদের সাথে সহাবস্থানই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, ধর্মীয় উপাদান তাদের ব্যক্তি গঠনে বিরাট প্রভাব রয়েছে এবং তার উচ্চাকাংখা ও স্বপ্নকে নতুন করে শানিত করার এবং টাকা পয়সা খরচ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে, যদিও ইহুদীদের কৃপণতা সম্পর্কে সকলেই অবিহিত এবং সে সব দেশ থেকে হিজরত করে আসার ক্ষেত্রে অনিহা যেখানে তারা দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করছে। কেননা সেখানে তাদের স্বার্থ জড়িত। আর তাকে সামরিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে ফেলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে অথচ ইহুদীদের ভীরুতা ও কাপুরুষতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। তারা ফিলিস্তীনকে তাদের রাষ্ট্র হিসেবে

চয়ন করেছে তাদের ধর্মীয় ভবিষ্যৎবাণী ও স্বপ্নের ভিত্তিতে যা তারা বিশ্বাস করে। তাদের দৃষ্টিতে এটা তাদের অঙ্গীকারের ভূমি। তারা তাদের চিন্তা-চেতনা এবং আশা আকাংখাকে নিয়েছে তাদের তালমুদ তাওরাতের শিক্ষা থেকে। তারা তাদের ধর্মীয় বর্ণবাদকে তাদের সমস্যায় এত গুরুত্ব দিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তা পশ্চিমা খৃষ্টানদেরকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাস দিতে পেরেছে যে, তারা তাদের ধর্মীয় অধিকার তালাশ করছে, যে সম্পর্কে তাদের তাওরাত সুসংবাদ দিয়েছে যে কিতাবটির প্রতি খৃষ্টানরাও ঈমান রাখে। যারা তাদের জাতীয় স্বপ্নকে বাস্তবায়নে সাহায্য করবে না, তারা হল তাওরাত অস্বীকারকারী, নবীদের শিক্ষাকে অস্বীকারকারী।

এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের ডাইরী, যা কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ক্যাম্পডেভিড চুক্তি সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তা এর সত্যতা বহন করে। তিনি তার প্রথম ইসরাইল সফর সম্পর্কে (মে, ১৯৭৩) এবং ছোট বেলায় ইঞ্জিলের ভূমি সম্পর্কে যা পাঠ করেছিলেন সে সম্পর্কে বলছেন। তিনি লিখেছেন, "আমি তিনদিন ধরে ফজরের পূর্বে উঠেই পুরাতন জেরুজালেমের রাস্তাঘাটে ঘুরছি এবং আমার সময়কে ভরিয়ে তুলেছি। রাত দিনের এই ভ্রমনে সে সব স্থান দেখে যা পূর্বে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

ইসরাইল সফর আমার ওপর এক বিরাট প্রভাব বয়ে এনেছে। আমি যখন আমার নির্বাচনী প্রচার শুরু করি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তখন আমি মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ইতিহাস অধ্যয়ন করতে শুরু করি এবং যখন আমাকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য নমিনেশন দেয়া হয় তখন আমি ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য আমেরিকার সমর্থনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করি।"

তিনি বলেন, "ইহুদী-খৃষ্টান চরিত্র বুঝা ও তাওরাত অধ্যয়নই ইহুদী ও খৃষ্টানদের মাঝে সেতুবন্ধন। এই সেতুবন্ধন আজ আমার জীবনের একটি অংশেই পরিণত হয়েছে। আমি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম যে, ইহুদীদেরকে নাজির নির্মূল করতে সক্ষম হয়নি তারা একটি দেশ পাওয়ার অধিকারী। তারা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার রাখে। আমি তাদের এই জাতীয় রাষ্ট্রকে তাওরাতের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে মনে করি।

এজন্য এটি এমন এক কাজ যা আল্লাহ্ বিধিবদ্ধ করেন। আর আমি আমার সৃষ্টিগত ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছি যে, আমি ইসরাইলের নিরাপত্তার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। এমন ওয়াদাবদ্ধ যা থেকে এক চুলও নড়চড় হবো না। (আশ্‌শারকুল আওসাত, জিদ্দা, ৪/১০/১৯৮২)

কয়েক বছর ধরেই একজন সুপরিচিত ইসরাইলী জেনারেলের বিবৃতি প্রকাশ করা হচ্ছে। তিনি হলেন জেনারেল মোশে দায়ান। এতে তিনি জেরুজালেমকে ইসরাইলের সাথে যুক্ত করে নেয়ার ও নতুন নতুন বসতি স্থাপনের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেন, যারা এই নীতির বিরোধীতা করছে তাদের উচিৎ এ ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জিলের অবস্থান অধ্যয়ন করে দেখা।

এই প্রচারনা বিভিন্ন মহাদেশে বসবাসরত অনেক খৃষ্টানের ওপর প্রভাব ফেলেছে। উস্তাদ কামেল শরীফ তাঁর লিখা 'আফ্রিকায় ইসরাইলী অপতৎপরতা" গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, নাইজিরিয়ার এক রাজনৈতিক নেতা তার বইয়ে লিখেছেন, বিশ্ব ইতিহাসে ইসরাইল কোন নতুন নাম নয়। আমি আমার গ্রামে থাকতেই জেনেছিলাম যে, 'ইসরাইল জাতিই হল আল্লাহর পছন্দনীয় জাতি।'

আমাদের শত্রুরা দ্বীনি দিকটাকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে চরম বাড়াবাড়ি করেছে এবং নিজস্ব স্বার্থে এটাকে কাজে লাগাবার জন্য চেষ্টা করেছে। এমনকি পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের পর আমাদের কিছু কিছু সামরিক কর্মকর্তার সামনে প্লাকার্ড তুলে ধরেছে যাতে কুরআনের এ বাণী লিখা ছিল, "কত ক্ষুদ্র দল, কত বড় দলের বিরুদ্ধে আল্লাহর ইচ্ছায় জয়লাভ করেছে। আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৯)

আবার কখনো কখনো এ বাণী তুলে ধরেছে, "মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য ছিল।" (সূরা রূম ঃ ৪৭)

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল যা আমরা শুনেছি ও পড়েছি মেনাহেম বেগীনের বক্তব্যে যা সে ফিলিস্তীনে ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ইসরাইলী সিনাগগে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের বক্তব্যের পর বলেছিল, ফিলিস্তীনে ইসরাইলের ঐতিহাসিকভাবে চিরস্থায়ী অধিকার রয়েছে, যার পক্ষে কিতাব সমূহে প্রমাণ আছে। এমন কি কুরআনেও প্রমাণ রয়েছে।

তারা সূরা মায়েদার ২১ নং আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করে, যাতে মুসা (আ.) তাঁর জাতিকে বলেন, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করোনা তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

এবং তিনি বলেন, "মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য পবিত্র ভূমিকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং কারো জন্যই জায়েয হবে না ধর্মীয়ভাবে যে, সে এনিয়ে আমাদের সাথে ঝগড়া করে।" আয়াতের অর্থ হলঃ তিনি তাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন এতে প্রবেশের। তাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত স্বরূপ ৪০ বছর ধরে মরুভূমিতে নির্বাসিত থাকার পর তারা এতে বাস্তবিকই প্রবেশ করেছিল। তাদের নবীর সাথে তাদের বাক্যালাপ ছিল চরম অবজ্ঞা ও ধৃষ্ঠতাপূর্ণঃ "আমরা এতে প্রবেশ করব না যতক্ষণ তারা এতে থাকবে। সুতরাং আপনি ও আপনার প্রভূ যান এবং আপনারা দু'জনে লড়াই করুন। আমরা এখানেই বসে থাকলাম।" (সূরা মায়েদা ঃ ২৪)

আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাদের জন্য সেখানে চিরস্থায়ী থাকার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন নতুবা এটা বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়। তারাতো সেখান থেকে প্রায় দুই হাজার বছর ধরে বহিস্কৃত।

ষষ্ঠ উৎস- নিজেদের সম্পর্কে ইহুদীদের লিখনি ঃ

এখন আমি উল্লেখ করছি ইহুদীরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে যা লিখছে, তা হচ্ছে ইহুদী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে, তার গঠনপ্রণালী ও তার পরিচিত, তার ঝোক ও বন্ধুত্ব, তার কল্পনা ও স্বপ্ন, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে।

আমি এখানে কুয়েত থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'যায়নবাদের আইডোলজী' নামক বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি। এ বইতে লেখক নির্ভর করেছেন ইহুদীদের লেখার উপর, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী মতবাদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির লেখক লেখার উপর। তাদের গ্রন্থের ব্যাখ্যা, ওহীর ভবিষ্যবাণী এবং তাদের ঐতিহাসিক দাবী ও বর্তমান অবস্থা এবং সর্বগ্রাসী আকাংখা ও তাদের তিন মৌল উৎস যা দ্বারা তাদের আইডোলজী গঠিত জাতি ..... তাওরাত ...... ভূমি।

লেখক বলেন, একথা সুবিদিত যে, পূরাতন রূপান্তর মতবাদই ব্যক্ত করে ইহুদীর পারস্পরিক সম্পর্কের, ভূমি ও আল্লাহর মাঝের সম্পর্কের কথা। যদি

ইহুদী ইতিহাসকে বিশ্ব ইতিহাসের ভিত্তি ধরা হয় তাহলে পবিত্র ভূমিই হল দুনিয়ার কেন্দ্রস্থল এবং ভৌগলিক কেন্দ্রবিন্দু, ইহুদীদের ঐতিহাসিক চিন্তা চেতনার কেন্দ্র।

আমরা এখন কতিপয় যায়নবাদীর লেখনি উপস্থাপন করব যাতে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইহুদীদের রূপান্তরবাদ তাদের ব্যক্তি গঠনে এবং তাদের ভূমি সম্পর্কে কঠোর দৃষ্টি ভঙ্গী গড়ার পেছনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। পূরাতন রূপান্তর মতবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠে ইহুদী হাখাম হায়েম লান্ডাও এর বক্তব্যেঃ আমাদের জাতির আত্মা তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে সক্ষম হবে না যতক্ষণ না জাতীয় জীবন নতুন ভূমিতে ফিরে আসে। কেননা প্রভূর বাণী কেবল তার ভূমিতেই আমাদের জাতির ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে।

'ইহুদী হাখাম কোক বলেন, ইসরাইলী ভূমি ইহুদী জাতির আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটা আমাদের জাতীয় অস্তিত্বেরই প্রধান অংশ। তা আমাদের জীবন সত্ত্বার সাথে সংযুক্ত এবং আর তা আমাদের আভ্যন্তরীন অস্তিত্বেরই একটা অঙ্গ। আমরা যে ইসরাইলী ভূমির কথা বলি তা কেবলমাত্র আমাদের জাতির মাঝে ছড়িয়ে থাকা প্রভূর আত্মার মাধ্যমেই বুঝা সম্ভব এবং যার প্রভাব পড়ছে প্রতিটি শান্তিপূর্ণ অনুভূতির ওপর।

এই তিন রূপান্তর মতবাদ হয়তোবা ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী যায়নবাদীদের লেখনীতে প্রকাশ পাবে না, কিন্তু তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় বোবারের লেখায়। তিনি গান্ধীকে লিখেন, আমরা কখনো ইহুদী দাবী পরিত্যাগ করতে পারব না। কেননা সেখানে এমন কিছু রয়েছে যা আমাদের জীবনের চেয়েও মূল্যবান, সেটি জাতির কর্ম এবং পবিত্র মিশন। নিশ্চয় আমি বিশ্বাস করি মানুষের বিবাহ বন্ধন ও ভূমির ..... এই ভূমি আমাদেরকে স্বীকৃতি দেয় কেননা আমাদের মাধ্যমেই এটা সুফলা হবে।

মানুষের ওপর যে শিকল রয়েছে তাতে জাতিকে ভূমির সাথে এমনভাবে বেঁধেছে তা থেকে জাতি কোন ক্রমেই ছুটতে পারবে না।

বোবার যে 'বিবাহ বন্ধন' শব্দটি ব্যবহার করেছে এতে ইহুদী ঐতিহ্যের পবিত্রতার কথাই ব্যক্ত করেছে। কেননা আল্লাহর সাথে ইহুদী জাতির সম্পর্ককে

পুরাতন যুগে বৈবাহিক সম্পর্ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বোবারের অবস্থানও ভিন্ন নয় যদিও সে এখানে এক মিথ্যা পরিচয় উপস্থাপন করলো। হাখাম আককাবালীর অবস্থান সম্পর্কেঃ আমরা হলাম আল্লাহর বিশেষ জাতি। আমাদের উচিৎ হবে না নিজেদেরকে ইসরাইলী বলে পরিচয় দেয়ার তবে একমাত্র তখনই এ পরিচয় দেয়া যাবে যখন আমরা ইসরাইলের ভূমিতে থাকব।

বিদ্রোহী জর্ডন বলেন, জাতীয় মিশন কেবল তখনই পূরণ হবে যখন আমরা জাতীয় দেশের অভ্যন্তরে ফিরে যাব এবং তারা আকাশের নীচে চলে যাবে।

আমরা আমাদের দেশে ফিরে আসবো, তার প্রাকৃতিক মাটিতে আমরা চাষ করব। যা আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে এবং এর আকাশে ও বাতাসে এবং জমীনে আমাদের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দেব।

যখন সাবেক ইসরাইলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, যিনি ইহুদী প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং তাওরাতের ব্যাখ্যাকারী। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল- যদি কিছু দখলকৃত ভূমির ব্যাপারে ইহুদী ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক দাবী থেকে থাকে তাহলে তার জন্য রাজনৈতিক ভূমিকা থাকা আবশ্যক নয় কি? উত্তরে তিনি বলেন, এটি হল ইসরাইলের অস্তিত্বের মূল আর এটি হল ইহুদী জাতি, পবিত্র গ্রন্থ এবং ইহুদী ভূমি। এজন্যই যখন তাওরাত ও তাওরাতের জাতি একত্রিত হবে তখন অবশ্যই এর সাথে তাওরাতের ভূমিও থাকতে হবে।

লেখক যায়নবাদের উগ্রতা ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনায় বলেন, এই বিষয়টি যায়নবাদের চিন্তা চেতনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে মেনাহিম বেগীনের লেখা 'বিপ্লবী' নামক গ্রন্থে। উগ্রতার দর্শন সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমি যুদ্ধ করব তাহলেই আমি বেঁচে থাকব। রক্ত দিয়ে, আগুন দিয়ে, অশ্রু দিয়ে এবং ছাই দিয়ে যার ফলে এক নতুন আদর্শ পুরুষ বের হয়ে আসবে এমন আদর্শবান যা বিশ্ব বিগত আঠারশ বছরে দেখেনি, সবার আগে লড়াকু ইহুদী, আমাদের ওপর অবশ্য করণীয় হল আক্রমণ করা, হত্যাকারীদের আক্রমণ করব রক্ত দিয়ে, ঘাম দিয়ে। অবশ্যই আমরা একটা প্রজন্মের উত্থান ঘটাব যা হবে অহংকারী, মর্যাদাবান ও শক্তিশালী।"

বিন গোরিওনের নিকট উগ্রতাই ইহুদী ব্যক্তিত্ব গঠনে সক্রিয় শক্তি। সে

যায়নবাদের কান্ডারীদের এ বলে বিশেষিত করে, "আমরা রাত দিন অস্ত্র এসে পৌছার জন্য অপেক্ষা করতাম। অস্ত্র ছাড়া আমাদের কোন কথাই ছিলনা। যখন অস্ত্র আসলো তখন দুনিয়াতে আমাদের খুশি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমরা বাচ্চাদের মত অস্ত্র নিয়ে খেলা করি। আমরা কক্ষনো তা পরিত্যাগ করব না ... আমি পড়ি বা কথা বলি, অস্ত্র আমার হাতে বা আমার ঘাড়ের ওপর আছে। বিন গোরিওনের ইহুদী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এক নতুন অবস্থান তা হল অতীত যুগ থেকেই লড়াকু ব্যক্তিত্ব। "মুসা আমাদের মহান নবী। তিনি আমাদের জাতির ইতিহাসের প্রথম সেনাপতি।" এথেকেই সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে মুসা নবী ও মোসে দাইয়ানের মাঝে যৌক্তিক ভাবে বরং অবশ্যম্ভাবীরূপে যেন কোন ধর্মীয় ফাঁক-ফোঁকরের অবকাশ না থাকে। বিন গোরিওন বলিষ্ঠতার সাথেই বলছে যে, সে হল তাওরাতের সৈন্য। এরাই জাতিকে জর্ডান নদীর পাড়ে বসতি গড়তে সাহায্য করবে। সুতরাং এ কথার দ্বারাই সে পূর্ব যুগের নবীদের কথার ব্যাখ্যা করছে, আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে, কিভাবে আমরা উগ্রতা অর্জন করতে পারি কেননা সেটাই সর্বশেষ পবিত্রতা।

যদি উগ্রতা বীজতলা হয় যা থেকে নতুন ইহুদী জন্মলাভ করছে তাহলে তা সেই বীজতলা যা থেকে নতুন যায়নবাদ সমাজও জন্ম নিচ্ছে। ইসরাইলী সৈন্য ইসরাইলের প্রতিরক্ষাই শুধু করছে না বরং সেখান থেকেই স্বয়ং ইসরাইলী সভ্যতারও জন্ম হচ্ছে। "সেনা বাহিনী হল উদ্বাস্তু যুবকদের জন্য স্কুল। জাতির সদস্যের নার্সিং হোম এবং তার বীরত্ব ও সভ্যতার সূচনা বিন্দু। এজন্য অবশ্যই আমাদের প্রশিক্ষকরা সেনাবাহিনীকে শিক্ষা দিবে সেসব কিছু যাতে রয়েছে শক্তি বা পাওয়ার। সেনাবাহিনী হল অঙ্গীকারের ভূমিতে সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। হিজরত করে ভিন দেশ থেকে আগতরা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় ইসরাইলে এসে পৌঁছার পর পরই। এখানে এসে তারা নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং হিব্রু ভাষা শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের মাঝ থেকে সবধরনের দুর্বলতা দূর করে দেয়া হয় যেন সে ইসরাইলের সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়। বিন গোরিওনের কথা অনুযায়ী সেনাবাহিনী বিরাট মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বিভিন্ন দেশ থেকে হিজরত করে আসা ইহুদীদেরকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দিতে এবং নিজেদের মাঝে সমন্বিত করতে।

ইহুদীদের বন্ধু কে হবে এ সম্পর্কে লিখেন লুফী মনে করেন, ভিন দেশে থেকে ইহুদীবাদকে বিভিন্নভাবে সমর্থনকারীরা মূলত একনিষ্ঠ ইহুদী আত্মার সাথে খিয়ানত করছে। এ থেকেই ইহুদী বন্ধুত্বের বিষয়টি ফুটে উঠে, বন্ধু কে? যায়নবাদের এ প্রশ্নের উত্তর একেবারে পরিস্কার স্পষ্ট, ইহুদী বন্ধুত্ব তাদের জাতীয় রাষ্ট্রের জন্য। সে দেশের জন্য নয় ,যে দেশে তারা বসবাস করছে। এজন্য কাল্টাত যিকন সতর্ক করে বলেন, জার্মান সীমান্ত রেখা তাদেরকে কোন ভাবেই ইহুদী প্রীতি ও বন্ধুত্ব থেকে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কেননা ইহুদীদের জন্য বন্ধুত্ব হল ইহুদীবাদের তরে। এটি এমনই বড় ও মহান যে, তা রাষ্ট্রীয় সীমানায় আটকানো যায় না। "একনিষ্ঠ ইহুদী ততক্ষণ হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে ইহুদী রাষ্ট্রের নাগরিক হবে। কোন ইহুদীর অন্তরে জার্মানের জন্য সামান্যতম মমত্ব বোধ থাকবে না। কাল্টাত যিকন আরো বলেন, যে ইহুদীই অন্য দেশকে নিজের দেশ বলবে, সে ইহুদী জাতির সাথে খিয়ানতকারী। ওয়েজম্যান আরো স্পষ্ট করে বলেন, প্রত্যেক ইহুদীর গভীরে যায়নবাদ লুকায়িত রয়েছে। যাদের জাতীয় ভালবাসা ইহুদীবাদের রাষ্ট্রের ভালবাসার সামান্তরাল হবে তারা অবশ্যই ভৎসনা ও তিরস্কার যোগ্য।

সম্ভবত পৃথিবীকে ইহুদী ও গর্দভ বলে ভাগ করাই যায়নবাদের মূল ভীত্তি। এরপর এর সাথে যুক্ত করেছে নির্দিষ্ট সময় যা দুষ্টচক্রে পরিণত হয়। যেটি আমরা হাখাম মোশেহ্ বিন যায়নের অথবা মায়াই এর কথায় দেখতে পাই। তারা এমনভাবে তালমুদের ব্যাখ্যা করে যাতে ফিলিস্তিনীদের ধ্বংস করে গোটা ফিলিস্তীন দখল করে নেয়া যায়। এই বিভক্তি আরো উৎকট হয়ে ফুটে উঠে হাখাম আব্রাহাম ঝাফিদানের (মাসেল) বক্তব্যে। সে হল ইসরাইলের কেন্দ্রীয় সীনাগগের নেতা। সে আরবদের বিশ্বাস না করার জন্য উপদেশ দেয়। কেননা তার মতে ইহুদীরা ধর্মীয় মতে যেন গর্দভদের বিশ্বাস না করে। তেমনিভাবে হাখাম ইসরাইলী সৈন্যদের বলে, তোমাদের জন্য অনুমতি রয়েছে বরং তোমাদের ওপর ওয়াজিব যে, তোমরা গর্দভদের হত্যা করবে, যদিও তারা খুব ভাল হয় অথবা তারা বেসামরিক লোক হয়, যাদেরকে ভাল লোক বলে দেখা যায়। সে তালমুদ থেকে এ উদ্ধৃতি দেয়, তোমার কর্তব্য হল সর্বোত্তম গাধাদের হত্যা করা। সুতরাং বিষয়টি হয়ে উঠেছে চরম বর্ণবাদী যা সবকিছুকে নির্মূল করতে প্ররোচনা দিচ্ছে।"

এ হল .. আমাদের শত্রু

ইসরাইল সমস্যা হল যায়নবাদের তৈরী। এটি পক্ষপাত দুষ্ট, জন্মলগ্ন থেকেই অনৈতিকতার সাথে যুক্ত। এটি তার অস্তিত্বেরই অংশ। এটি তার সাময়িক বৈশিষ্ট নয় বরং মৌলিক বৈশিষ্ট। আর এটিই আমাদের ও তাদের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যদি আমাদের ভূমি দখলকারী আমাদের অস্তিত্বকে হুমকীর সম্মুখীনকারী শত্রুকে জানা ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে ওয়াজিব হয় তাহলে অবশ্যই এই আপদকে জানার চেষ্টা করাও একান্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যায়নবাদের বৈশিষ্ট্য যা তালমুদের শিক্ষা থকে গঠিত এর সাথে যুক্ত হয়েছে যায়নদের আকাশচুম্বী আকাংখা ও লোভ। আমাদের শত্রু কতিপয় পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। এসব তার চরিত্রেরই অংশ। আমরা এসব সম্পর্কে এখন আলোচনা তুলে ধরছি।

১. বর্ণবাদ ঃ

প্রথম বিপদ হল বর্ণবাদ। এটি ইহুদীদের ধর্মীয় গঠন থেকেই উৎপত্তি যা তাদের তাওরাতের আসফার ও এর সংযুক্তিতে রয়েছে। একে আবার লালন-পালন করেছে তালমুদের শিক্ষা যাকে ইহুদীরা তাওরাতের শিক্ষার চেয়েও বেশী সম্মান ও ভক্তি করে এবং পবিত্র বলে মনে করে। সুতরাং ইহুদী ধর্ম একটি জাতি আর তাওরাত হল সে জাতির ধর্ম গ্রন্থ বরং আল্লাহ হলেন সেই জাতির প্রভূ আর এ জাতি হল ইসরাইল জাতি।

আমরা দেখতে পাই কুরআন বলিষ্ঠতার সাথে ঘোষণা করেছে আল্লাহ হলেন 'মানুষের রব,' 'মানুষের মালিক' এবং 'বিশ্বজাহানের প্রভূ'। তিনি বলেননি, 'তিনি আরবদের প্রভূ' অথবা 'মুসলমানদের প্রভূ'। পক্ষান্তরে তাওরাত জোর দিয়ে বলছে, 'তিনি ইসরাইলের প্রভূ'।

বরং তাওরাতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র ইসরাইলীদেরকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ইসরাইলের ইতিহাসকে, ইসরাইলের স্বপ্নকে। এতে আখেরাতের কোন উল্লেখ নেই, জান্নাত জাহান্নামের উল্লেখ নেই। এতে শুধু জোর দেয়া হয়েছে ইসরাইল রাজ্যের এবং ইসরাইলের মান মর্যাদার।

তাওরাত এই জাতি সম্পর্কে বলে, এটি হলো "পছন্দনীয় জাতি।" আর আমরা বলি, যখন তারা তাওহীদের রেসালা বহন করছিল এবং পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং নবীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করছিল, তখন পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু যখন তারা নিজেরা পরিবর্তিত হয়ে গেল তখন আল্লাহও তাদের কাছে যা ছিল তা পরিবর্তন করে দিলেন। তারা তো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকেই পরিবর্তন করে ফেলেছে, তারা চরিত্রকে পাল্টিয়ে ফেলেছে এবং নবী রাসূলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কুরআন এ ব্যাপারে বলছে ঃ

«اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ »-(البقرة : ٨٧)

"যখনই কোন রাসূল তোমাদের মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু উপস্থাপন করেছেন তখনই তোমরা অহংকার করেছো। তোমাদের একদল তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছো এবং আরেক দল তাদের হত্যা করেছো।" (সূরা বাকারা ঃ ৮৭)

এজন্য ইউহান্না এবং মসীহ (আ.) তাদের বলেন, "হে নবীদের হত্যাকারীর সন্তানেরা।"

আল্লাহ বনী ইসরাইলদের বিশ্ববাসীর ওপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন, কুরআনের এ ঘোষণার তাৎপর্য হচ্ছে, এটা একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য আর তা হচ্ছে হযরত ইউসুফের সময় থেকে নিয়ে হযরত সুলাইমানের সময় পর্যন্ত। কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা বনী ইসরাইলের মধ্যে কুফরী করেছিল তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে দাউদ এবং ঈসা (আ.) এর জবানে অভিসম্পাত করা হয়েছে এবং তারা ছিল সীমালংঘনকারী। তারা অন্যায় কর্ম করলে কাউকে নিষেধ করত না। তারা যা করত তা খুবই জঘন্য কাজ ছিল।" (সূরা মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

"তাদের ওপর অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল তারা যেখানেই থাকুক না কেন একমাত্র আল্লাহর ছত্রছায়া এবং মানুষের ছত্রছায়া ব্যতীত। তারা আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হল এবং তাদের ওপর .... মেরে দেয়া হল কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিল এবং নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল। তারা অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করেছিল।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১২)

কোন কোন মানুষ মনে করে যে, ইসরাইলের 'আল্লাহর পছন্দনীয় জাতি' নামকরণ 'উম্মতে ইসলামীর নামকরণের মতই (উত্তম উম্মত, যাকে মানবতার জন্যই তৈরী করা হয়েছে) এটা নিরেট ভুল। কেননা উম্মতে ইসলামী বর্নবাদী উম্মত নয়। বরং এটি রিসালাতের উম্মত, যার রয়েছে মূলনীতি ও লক্ষ-উদ্দেশ্য। যে এর উপর ঈমান আনবে, একে গ্রহণ করবে, সে এ উম্মতের একজন হয়ে যাবে, তা সে যে কোন বংশের বা রংয়ের অথবা যে কোন দেশেরই হোক না কেন।

ইহুদীরা বিশ্বের সহানুভূতি লাভ করার চেষ্টা করেছে এই বলে যে, তারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, বিতাড়িত জাতি। তারা অভিযোগের এ তলোয়ার ব্যবহার করেছে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ভাবে, আর তা হল শামীয়দের শত্রুতা।

বাস্তবতা হল অধিকাংশ ইহুদীই শামীয় নয় এবং ইসরাইলের ঔরসজাত নয়। অনেক পশ্চিমা গবেষক প্রমাণ করেছেন যে, আজকের ইহুদীরা ইহুদী নয় অর্থাৎ তারা শামীয় নয় এবং ইসরাইলীও নয়। বরং ইহুদীদের বিরাট অংশ হল খাজর রাজ্যের ইহুদীদের বংশধর যা পূর্ব 'ইউরোপে উৎপত্তি লাভ করে, যখন কতিপয় 'তাতারী গোত্র' ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। খাজর রাজ্যের পতনের পর তাদের কিছু সংখ্যক করম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং পোল্যান্ড তাদের প্রধান হিজরতের স্থানে পরিণত হয়। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে এখানে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় অর্ধ মিলিয়নে (পাঁচ লাখে)। এখানে তারা পর্যাপ্ত পরিমানে স্বায়ত্ব শাসনের সুবিধা ভোগ করে। এরপর ইউক্রেন-শ্যাম ব্রেকাটক বাহিনী এসে তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালায় এবং ১৬৫৮ সালে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়।

ইহুদীরা আজ বিশ্ববাসীর কাছে এবং বিশ্ব শক্তির কাছে শামীয়দের প্রতি শত্রুতার কথা বলে যতই চিৎকার দিক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারাই আজ মূল শামীয় ফিলিস্তীন-আরবদের শত্রুতা করছে। আমাদেরকে তারা অন্যায় ভাবে নিজ ঘরবাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে । যে ইহুদীরা নাজি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল আজকে তারাই এক নতুন নাজি বর্ণবাদী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে দেখে না, অন্যের অধিকারের স্বীকৃতি দেয় না, বিশেষ করে যদি তার এতে স্বার্থহানী ঘটে।

২. উগ্রতা ও শত্রুতা ঃ

যদি বর্ণবাদ ইসরাইলের প্রথম রোগ হয় এবং তা তার মূল গঠন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়, তাহলে দ্বিতীয় রোগ হল উগ্রতা, শত্রুতা, বিদ্বেষ ও বর্বরতার সমষ্টি। তাদের পবিত্র গ্রন্থ তাওরাতে পর্যন্ত তাদেরকে বলেছে কঠিন হাড্ডির জাতি।

কুরআন এ বিষয়টিকে ব্যক্ত করেছে এ বলে, "অতপর তোমাদের অন্তঃকরণ পাথরের চেয়েও কঠিন শক্ত হয়ে গেছে বা তার চেয়েও কঠিন। পাথরের মধ্যে কিছু রয়েছে যা ফেটে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, আর কিছু ফেটে পানি বের হয়। আর কিছু পাথর রয়েছে যা আল্লাহর ভয়ে নীচে পতিত হয়। তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন নন।" (সূরা বাকারা ঃ ৭৪)

কুরআনে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই কাঠিন্য হল তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি স্বরূপ, তারা তাদের কৃত ওয়াদা ভঙ্গের কারণে। মহান আল্লাহ বলেন, "তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণেই তাদের উপর আমরা অভিশাপ বর্ষণ করি এবং তাদের অন্তঃকরণকে কঠিন করে দেই।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৩)

ইসরাইল ধর্মের মূল সূত্র গুলোই তাদের প্রকৃতিগত ভাবেই বিদ্বেষপূর্ণ করে গড়ে তুলেছে। তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে কত রক্ত ঝরল সেদিকে কোনই ভ্রুক্ষেপ করে না। কত অধিকার লুণ্ঠিত হল, আর কত ঘরবাড়ী ও জনপদ ধ্বংস হল এবং কত ধন সম্পদ বিনষ্ট হল। মানুষকে তারা পণ্য হিসেবে গণ্য করে তারা বিশ্বাস করে অন্য ধর্মের মানুষের দায়িত্ব হলো শুধু ইসরাইলীদেরই খিদমতকরা।

এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাওরাতের পাঁচটি আসফারে এবং নবীদের আসফারে যা এই আসফারের সাথে সংযুক্ত বিশেষ করে সফরে আশইয়াতে যা ইসরাইলীদের নিকট খুব আকর্ষণীয় যাকে তারা নাম দিয়েছে লড়াকু নবী বলে।

যে তালমুদের দিকে ইহুদীরা তাওরাতের চেয়েও বেশী আকৃষ্ট, সে তালমুদে এটি খুবই স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে । তারা তালমুদকে তাওরাতের চেয়েও বেশী পবিত্র বলে মনে করে।

মেনাহিম বেগীন যে ছিল ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পূর্বে পাপিষ্ঠ গোঁড়া যায়নবাদের একজন শীর্ষস্থানীয় সদস্য এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর লিকুদ কোয়ালিশনের

প্রেসিডেন্ট সে তার 'বিদ্রোহ' নামক গ্রন্থে বলে, আমি লড়াই করব তাহলেই আমি বেঁচে থাকব।

ইহুদীদের বর্তমান ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে কেউ দেখতে পাবে বিশেষ করেঃ ফিলিস্তীনীদের মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করা ও তাদের হত্যা করা যার ফলে ফিলিস্তিনীরা তাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এজন্য তারা আজ পর্যন্ত শত্রুতামূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, সরকার চালাচ্ছে এবং চালাচ্ছে বসতিস্থাপনকারীরা এবং ফিলিস্তিনী ভূমি জবরদখল করে নিচ্ছে। সে খোদ ইসরাইলে, পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখন্ডে গণ হত্যা চালায়, শাবরা ও শাতিলা উদ্বাস্তু শিবিরে গণহত্যা চালায় এবং খলিলী মসজিদে রমজান মাসে ফজরের নামাজে রুকু সিজদারত অবস্থায় মুসল্লিদের উপর ব্রাশ ফায়ার করে, কাফা এবং কুদস-এর সুড়ঙ্গ পথে নির্বিচারে গুলি করে মুসলমানদের হত্যা করে।

ইতিপূর্বে যা প্রকাশ পেয়েছে মিসরীয় বন্দীদেরকে নির্বিচারে হত্যা এবং মিসরের বাহরে বাকল এর ছাত্রদেরকে নির্বিচারে গ্রেফতার ও হত্যা এবং বন্দী নির্যাতন, গেরিলা আক্রমনকারী পরিবারের সাথে বর্বর আচরণ ও তাদের ঘরবাড়ী বুলডোজার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া। এরপর রয়েছে রাষ্ট্রের প্রচেষ্টা যার চূড়ান্তরূপ হচ্ছে পূর্বের এবং বর্তমানের প্রধান মন্ত্রীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করার নির্দেশ, তাদের নির্মূল করার আদেশ। যেমনটি রবীন করেছে ফাতহী শাকাকী ও ইহইয়া আইয়াশকে হত্যা করার ক্ষেত্রে এবং যেমনটি করেছে নিতানিয়াহু হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালিদ মাশআলকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় এবং মোসাদ কর্তৃক আড়িপাতার খবর ফাঁস হয়ে যাওয়া এসবই তারা করছে শক্তির জোরে। ইসরাইলের কাজই হল গায়ের জোরে উগ্রতা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি করা। এরা কোন যুক্তির ধার ধারে না।

আমরা আশ্চর্যবোধ করছি সে জাতির ব্যাপারে যারা নাজিদের কর্তৃক অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা বলে চিৎকার করল তারা কিভাবে আরেকটি জাতিকে নিপীড়িত করতে পারে? তার স্বাধীনতা ও ভূখন্ডের ওপর শত্রুতা করতে পারে? যাদের কোনই অপরাধ নেই এছাড়া যে, তারা তাদের দেশকে আঁকড়ে ধরে আছে এবং তার মালিকানার প্রতিরোধ করে যাচ্ছে?

৩. সম্প্রসারণবাদ ঃ

ইসরাইলের মাঝে তৃতীয় যে রোগটি মজ্জাগতভাবে রয়েছে তা হল ঃ সম্প্রসারণবাদী স্বপ্ন ও আকাংখা।

সে যে ভূমি দখল করেছে তা নিয়েই সন্তুষ্ট নয় এবং যে ধনসম্পদ লুটপাট করেছে তা নিয়ে তুষ্ট নয়। সে শুধু লুটপাট করেই ক্ষান্ত নয় বরং চুরি করতেও ওস্তাদ। তাদের অবস্থা জাহান্নামের মত– যাকে বলা হবেঃ "তোমার পেট কি ভরেছে। সে বলবে আরো কিছু আছে কি?"

সে এখনও বৃহত্তর ইসরাইলের স্বপ্ন দেখে- ফোরাত থেকে নীল পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন, হে ইসরাইল তোমার রাজ্য হল ফোরাত থেকে নীল পর্যন্ত এবং চাউলের দেশ থেকে খেজুরের দেশ পর্যন্ত। ইরাকের ফোরাত থেকে মিসরের নীলনদ পর্যন্ত এবং লেবাননের ধান গাছ থেকে মদীনার খেজুর গাছ পর্যন্ত যেখানে তাদের পূর্ব পুরুষরা বসবাস করত।

একথাটি প্রকাশ্যে বলেছে তেলআবীব ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক 'ইসরাইল শাহাক'। তিনি ইসরাইলের গোপন অভিপ্রায় প্রকাশ করে দেন এবং তার ইংরেজী ভাষায় লেখা বইয়ে সেটির বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এতে পরিস্কার করে লিখেন, 'ইসরাইল তার রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন দেখে তা সম্প্রসারিত হবে সিরিয়ার কিছু অংশ, লেবানন, তুরস্ক, ইরাক, সৌদী আরব, ইয়েমেন, কুয়েত এবং মিসরের ইস্কান্দারিয়া পর্যন্ত।" বাস্তবে তারা গোটা বিশ্বের উপর নিয়ন্ত্রণ চায়। কিন্তু তাদের নীতি হল দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া।

কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন, এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়া সুদূর পরাহত। ইসরাইলের মত রাষ্ট্রের পক্ষে এমন অবাস্তব স্বপ্নের পিছনে ছুটা বাস্তব সম্মত নয়। বর্তমান ভূমিতে তা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সে এখন বেশী বুদ্ধিমান যে এ ধরনের স্বপ্নের কথা বলবে।

আমরা বলছি, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিও এক সময় অর্থাৎ প্রায় শত বছর ধরে স্বপ্ন বা কল্পনা ছিল। এরপর তা বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। আজ হয়ত ইসরাইল এ ব্যাপারে কথা বলছে না, কারণ এতে তার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। সে তার পর্যায়ক্রমিক রাজনীতির ধারাবাহিকতায় এ ব্যাপারে কিছুদিন চুপ থাকবে ।

আমরা কত প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করেছি কেননা তা ছিল আমাদের অধিকারের চেয়ে কম, যেমন ভাগাভাগির সিদ্ধান্ত। এরপর আমরা কত কামনা করেছি যে, যদি আমরা সেটি গ্রহণ করতাম যা প্রত্যাখান করেছিলাম।!

ইসরাইল তার স্বপ্ন, পরিকল্পনা ও লক্ষ্য কার্যকর করতে সদা সচেষ্ট, যাকে আমরা এক সময় মনে করতাম অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের কাছে যা স্বপ্ন বলে মনে হতো তা আজ আমাদের কর্নকুহরে এবং পায়ের নিচে।

এখানে একটি বিষয় যেন আমরা ভুলে না যাই যে, আজ পরাশক্তি ইসরাইলকে সাহায্য করেছে। বর্তমানেও তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। শুরুতে ছিল গ্রেট ব্রিটেন, যে তাকে ফিলিস্তীনে রাষ্ট্র প্রতিষ্টার ওয়াদা দিয়েছিল। বৃটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেলর্ফোড এর বিখ্যাত অঙ্গিকারের মাধ্যমে ২/১১/১৯১৭ সালে। যাতে বলা হয়েছিল ঃ 'কে অধিকার রাখে না ওয়াদার, যে এর অধিকারী নয় তার জন্য।' তবে এর শেষ হল আমেরিকার দ্বারা- বিশ্বের বর্তমান পরাশক্তি এবং বিশ্বের একক মোড়ল যে ইসরাইলের পিছনে রয়েছে সম্পদ, অস্ত্র এবং ভেটো নিয়ে। যদি আমেরিকার সম্পদ, আমেরিকার অস্ত্র এবং আমেরিকার ভেটো না থাকতো তাহলে ইসরাইল আজ যেখানে পৌছেছে সেখানে পৌঁছতে পারতো না।

আর সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন জীবিত ছিল তখন বলেছিল, ইসরাইলের সৃষ্টি হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য।

৪. অনৈতিকতা ঃ

ইসরাইল আরব ও ফিলিস্তিনীদের সাথে কর্মকান্ড সম্পদানের সময় ইসরাইল কোন নীতি-নৈতিকতার পরোয়া করে না। তার দর্শন হল নৈতিকতা পরিবর্তনশীল, এটি স্থায়ী নয়। এর বিভাজন সম্ভব সুতরাং এর ব্যাপকতাও নেই। এজন্য দ্বিমূখী নীতি অবলম্বন করলে কোন অসুবিধে নেই। নিজেদের ক্ষেত্রে এক রকম আর গর্দভদের ক্ষেত্রে অন্য রকম। দুঃখজনক হল যে এই নীতি তাদের তাওরাতেই উল্লিখিত রয়েছে। এর সাফারুত্ তাসনিয়াতে রয়েছে; অন্যের নিকট থেকে সুদ নেয়া ইসরাইলীদের জন্য বৈধ কিন্তু কোন ইসরাইলীর কাছ থেকে সুদ নেয়া যাবে না। ইসলাম যা সাব্যস্ত করেছে এ নীতিটি তার সম্পূর্ণ উল্টোটি;

নিশ্চয় বৈধ, সকলের জন্য বৈধ, আর যা হারাম তা সকলের জন্যই হারাম। কুরআন বলছে ইসরাইলরা অন্যদের সম্পদ বৈধ করনের এই জন্য ঘৃণ্য পন্থা বেছে নিয়েছে এবং তারা এটা ধর্মীয় ভাবে পাপ বলে মনে করে না, সে কথাও কুরআনে রয়েছে এভাবে ঃ

«ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْأُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ج وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ»۔ (آل عمران : ٧٥)

"এটা এজন্যই যে, তারা বলে, নির্বোধের জন্য আমাদের ওপর কোনই পথ খোলা নেই। তারা জেনে শুনে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৫)

তেমনিভাবে ইসরাইল জাহেলী মতাদর্শ গ্রহণ করেছে; এক বছর হালাল আরেক বছর তা হারাম করার। হালাল হারাম করা তার ইচ্ছামত এবং বিশেষ স্বার্থ হাসিল হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তেমনিভাবে সে ম্যাকিয়াভেলী দর্শনের পক্ষপাতী; 'উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোন পন্থা গ্রহণ করাই বৈধ', সুতরাং ইসরাইলের স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোন পন্থা গ্রহণই বৈধ। এতে কেউ প্রতিবাদ করল কিংবা নিন্দা জানাল তাতে কিছু যায় আসে না।

আরব ও মুসলমানেরা চরিত্রবান জাতি, তাদের দ্বীন তাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং কর্মকান্ডে নৈতিকতা আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞান নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ইসলামী বিধি-বিধান নৈতিকতা বিবর্জিত নয়, অর্থনীতি নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যুদ্ধ-বিগ্রহও নৈতিকতার গন্ডীর বাহিরে নয় এবং রাজনীতিও নৈতিকতা থেকে সম্পর্কহীন নয়।

'উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে কোন কর্মপন্থা বৈধ' ইসলাম কখনো এ নীতি সমর্থন করে না। বরং উদ্দেশ্য ভাল হওয়া ওয়াজিব, এর মাধ্যমেই আমল পবিত্র হবে। সৎ উদ্দেশ্য সাধনে পবিত্র মাধ্যম গ্রহণ করা জরুরী। ইসলাম হককে বিজয়ী করার জন্য বাতিল পন্থা গ্রহণে সম্মত নয়, কেননা মহান আল্লাহ পূত-পবিত্র। তিনি একমাত্র পূত-পবিত্রকেই কবুল করেন।

নিজ স্বার্থের অনুকূলে হলেই ইসরাইল অনেক সময় অঙ্গীকার মেনে চলে, তা দেখে আমরা আশ্চর্য হই না। কিন্তু যদি তার স্বার্থ বিরোধী হয় তখন ইসরাইল

একে দেয়ালের ওপরে ছুঁড়ে মারে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামীন নেতানিয়াহু ওয়াসলো চুক্তি ও এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে (যা আমরা সরাসরি প্রত্যাখান করেছি) উত্তরে বলে: সেটাতো মৃত।

তাদের পূর্ব পুরুষদের ব্যাপারে কুরআনের বাণী এভাবেই বাস্তবে পরিণত হয়েছে ঃ

«اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِىْ كُلِّ مَرَّةٍ وَّهُمْ لاَ يَتَّقُوْنَ»۔ (الانفال : ٥٦)

"যাদের সাথে আপনি চুক্তি করেছেন, এরা প্রতিবারই তা ভঙ্গ করেছে। এরা কোন কিছুকেই ভয় করেনা।" (সূরা আনফাল : ৫৬)

কিছু ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ যা বলেছেন, এরা সে নীতিই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে : 'চুক্তিপত্র হচ্ছে মূলত দুর্বলের ওপর শক্তিমানের দলিল, এছাড়া আর কিছু নয়।'

ইসরাইলের চরিত্রই হল উগ্রতার চরিত্র, সন্ত্রাসী চরিত্র এবং আগ্রাসী চরিত্র। রাষ্ট্রটি এ চরিত্রের উপরই চলছে এবং এর নিয়ন্ত্রনে রয়েছে সন্ত্রাসী চক্র, আর এর বসতি স্থাপনকারীরা এ চরিত্রই দেখিয়ে যাচ্ছে, রাষ্ট্রের শক্তি রক্ষায় সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনীদেরকে ইসরাইল সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করছে যারা নিজেদের দেশ, ঘর-বাড়ী, ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ বাস্তবে সেই হল আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী। কেননা সে শক্তি, উগ্রতা ও অস্ত্রের জোরে অন্যের হক কেড়ে নিচ্ছে। সন্ত্রাসের জোরেই ইসরাইল আজ অন্যের দেশ, জায়গা-জমি জবর দখল করে আছে। এ বিষয়টিলেখক ড. হায়সাম আল কিলাকী এভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'সন্ত্রাসের দ্বারা সৃষ্ট রাষ্ট্রের একমাত্র; প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ইসরাইল।'

ইসরাইলী অনৈতিকতা ও বর্বরতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। সর্বশেষ উদাহরণ বলা যায় যে, জর্ডানে হামাসের রাজনৈতিক শাখার প্রধান খালেদ মাশআলকে হত্যা প্রচেষ্টা। তাকে উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। তা হচ্ছে উন্নত কেমিক্যাল প্রয়োগে তাঁকে হত্যা চেষ্টা চালান হয় এবং এজন্য কানাডীয় জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করা হয়।

এজন্য তারা তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ জর্দানের ভূমি ব্যবহার করতেও কোন তোয়াক্কা করেনি। শুধুমাত্র মহান আল্লাহর মেহেরবানীতে এবং খালেদের সতর্কতা ও সঙ্গীসাথীদের বিচক্ষণতায় এবার তিনি রক্ষা পেয়েছেন। কেউ ধারনাই করতে পারত না যে তাকে হত্যা করা হয়েছে। ইসরাইল এই ধরনের সন্ত্রাসই বহুযুগ থেকে চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখনও তা অব্যাহত রেখেছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এ্যরিয়েল শ্যারণ ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার সাথে ঘোষণা করে: খালেদকে হত্যা প্রচেষ্টা যদি এবার ব্যর্থ হয়ে থাকে তাহলে তা বার বার চলবেই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়ন হবেই। এভাবেই এ সন্ত্রাসী বলেছে, এতে সে কারো কোন তোয়াক্কা করেনি। এর কোন লজ্জাই নেই যার ফলে সে যা ইচ্ছা তা-ই করছে।

আর ফিলিস্তিনীদের জিহাদ (যদিও তারা এটিকে সন্ত্রাস বলে থাকে) বৈধ জিহাদ। তা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের এ বাণীরই সাড়া দান : "তাদের বিরদ্ধে সবরকমের প্রস্তুতি গ্রহণ কর, ঘোড়া থেকে শুরু করে, যাদ্বারা তোমাদের শত্রুকে ও আল্লাহর শত্রুকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলবে।" সুতরাং এ জিহাদ (সন্ত্রাস) হল প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষার জন্য, অবৈধকে বৈধ করার জন্য নয়।

অনৈতিকতা ইহুদীদের চরিত্রে নতুন কিছু নয় বরং এটি তাদের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট, যা তারা তাদের ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে স্তরে আমল করেছে। এমনকি তাদের নবীদের সাথেও। তাদের পবিত্র গ্রন্থ সমূহেও একথা বর্ণিত রয়েছে।

তাদের প্রাচীন গ্রন্থে তার লেখকের জবানীতে উদ্ধৃত হয়েছে, ইয়াকুব এবং তার মা ইসহাককে ধোকা দিয়েছেন যেন তার বড় ভাই ঈসার পরিবর্তে ইয়াকুবের জন্য বরকতের দু'আ নেয়া যায়। ...... ইয়াকুবের স্ত্রী রাহীল তার পিতার মূর্তি চুরি করে নেয় ইব্বানের জন্য (ইয়াকুবের মামা) তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন।

এর পূর্বে সাফারুত তাকভীনে উল্লেখ রয়েছে, লুত তার দুই মেয়ে কর্তৃক মাতাল হয়ে তাদের সাথে কুকর্মে লিপ্ত হয় এবং তার ঔরষে মোবেঈন ও উমুর্নিয়ামদের জন্ম, তারা জারজ সন্তান।

ইয়াকুবের আসফারে বনী ইসরাইলের হাতে আরিহা পতনের এবং ধ্বংসের সংবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, তরবারী দ্বারা সবার উপরে ফয়সালা করা হয়

পুরুষ, মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধ এমনকি গরু ছাগল এবং গাধাও।

প্রথম সামুইল এর সফরে বর্ণিত হয়েছে ঃ প্রভু আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি তোমাকে ইসরাইলীদের বাদশা বানিয়ে দেয় ...... সুতরাং তুমি এখন যাও এবং আমালিকদের আক্রমণ কর .... তাদের কাউকে অবশিষ্ট রেখ না ..... তাদের সবাইকে হত্যা কর..... পুরুষ, মহিলা, শিশু এবং দুগ্ধপোষ্য .... গরু, ছাগল এবং গাধা।

উক্ত আসফরে এসেছে ঃ বাদশা শাউল দাউদের নিকট তার মেয়ের জন্য মোহর চান একশ ফিলিস্তীনী গালাফ .... দাউদ এ বিষয়টিকে খুবই ক্রুদ্ধভাবে গ্রহণ করেন, এজন্য তিনি দু'শ ফিলিস্তিনীকে হত্যা করেন.... এবং তাদের পূর্ণ গালাফ দেন .... তাদের বাদশার সাথে শ্বশুর হওয়ার দাবীর।

উক্ত সফরে আরো উল্লেখ রয়েছে ঃ দাউদ রাজা শাউলের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ফিলিস্তীনদের সাথে হাত মিলান ইসরাইলী রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কিন্তু ফিলিস্তিনীরা দাউদের সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ... অতপর দাউদ তাদের রাজার ভাই আমইয়াশ এর নিকট বলেন, আমি কি অপরাধ করেছি? আপনার বান্দার মধ্যে কি দোষ পাওয়া গেছে যে, রাজার শত্রুদের সাথে লড়াই করতে অংশ নিবনা?

দ্বিতীয় সামুইলের সফরে এসেছে ঃ আমনু তার বোন সামারকে ধর্ষণ করে, এরা দাউদের সন্তান। অতপর আবশালুম ইবনে দাউদ পিতার রাজ্যে বসবাস করতে করতে পিতার রাজ্য দখলের লোভে পিতার সাথে যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধে পুত্র নিহত হয়।

রাজা বাদশাহদের সফরে .... সোলাইমান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সাইদুনিয়ীনদের প্রভু আশতারুতের ইবাদত করেন ... এবং তাদের বাদশা উমুনীনদের প্রভূর উদ্দেশ্যে মালভূমিতে যবেহ (ভোজ অনুষ্ঠান) করেন।

এসবই তাদের পবিত্র আসফার সমূহে বর্ণিত হয়েছে, আমাদের কথা নয়।

এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই যে, মসীহ (আ.) তাদের বলেন, লোক দেখানো লেখকরা! তোমাদের জন্য জাহান্নাম। হে বিচ্ছুরা! অজগরের সন্তান। নবীদের হত্যাকারীর সন্তান। তোমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারবে?

৫. কৃপণতা ও অর্থ পূজা ঃ

ইসরাইলীদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অর্থ পূজা, অর্থ লোভ এবং কৃপণতা। পূর্বে তারা স্বর্ণের গো বাছুরের পূজা করেছে। এটি তাদের স্বর্ণের সাথে জড়িত থাকার কথারই ইঙ্গিত বহন করে এবং এর প্রতি লোভের। কুরআন তাদেরকে চিহ্নিত করেছে কৃপণ হিসেবে এবং এভাবেই চিত্রিত করেছে ঃ

«اَمْ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَاِذًا لاَّ يُؤْتُوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا »-

"তাদের কি রাজ্যের কোন অংশের মালিকানা রয়েছে যেন তা থেকে কাউকে কানাকড়িও না দেয়।" (সূরা নিসা ঃ ৫৩)

আল্লামা রশীদ রেজা তাঁর বিখ্যাত 'তাফসীর আল-মানার'-এ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, اَمْ 'আম' বা কি, বিচ্ছিন্ন শব্দ, আর বসরাবাসীদের নিকট এটি প্রশ্নবোধক এবং পরিবর্তন বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। পরিবর্তন বলতে বুঝায়: তাদের ঈমান পরিত্যাগ করে তাগুতের আনুগত্য করা এবং শয়তানের পায়রবী করা। এ ছাড়াও মুমীনদের পরিবর্তে মুশরিকদের প্রধান্য দেয়ায়, কৃপনতা ও অর্থ লোভের জন্য তাদেরকে ভৎসনা করা হয়েছে। ইমামের মতে 'আম' শব্দটি যদি বাক্যের প্রথমে আসে তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় সাধারণ প্রশ্নবোধক আর এখানে প্রশ্নবোধক হচ্ছে তাদেরকে ভৎসনা করার উদ্দেশ্যে এবং তা বুঝা যায় রাজ্যের অংশে রয়েছে বলে প্রশ্ন উথাপন করায়, যেমন তাদের কিতাবের অংশ রয়েছে? বরং তারা রাজ্য হারিয়েছে তাদের অত্যাচার ও অবাধ্যতার কারণে (সুতরাং তারা মানুষকে কানাকড়িও দিবে না।) অর্থাৎ যদিও তাদের রাজ্যের অংশ থাকত তাহলেও তাদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য মোতাবেক কৃপণতাকে অগ্রাধিকার দিত এবং নিজেদের স্বার্থ আগে সংরক্ষণ করত। সুতরাং তখন তা থেকে কাউকে কানাকড়িও দিত না। .... (নাকির) শব্দের অর্থ হল খেজুরের বিচির উপর যে পাতলা সাদা পর্দা থাকে সেটা। এখানে তাদের কৃপনতার উদাহরণ টানা হয়েছে এ তুচ্ছ বস্তুর সাথে অথবা পাখির নাকিরে (ঠোকরে) যে টুকু বস্তু আসে সে পরিমাণও তারা কাউকে দিতে রাজি নয়। অতি সামান্য অর্থেও নাকির শব্দটি ব্যবহৃত হয় যেমন বলা হয়েছে....... "তারা সামান্যতম জুলুমেরও শিকার হবে না।"

এর অর্থ হল: এ ইহুদীরা হল কঠিন ব্যক্তিকেন্দ্রীক এবং অত্যধিক কৃপণ। বাস্তবতা হলো, কেউ তাদের কাছ থেকে কোন উপকার পায় না। ইহুদীরা নিজেদের ছাড়া অন্য কারো কথা চিন্তা করে না। যদি তারা কোন কিছুর মালিক হয় তাহলে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যেন অন্যরা তা থেকে অতি সামান্য উপকারও নিতে না পারে। এ থেকেই বুঝা যায় যে তাদের জন্য কত কষ্টকর যে, তাদের উপর এক আরবী নবী হবেন এবং তার সঙ্গী-সাথীদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। যেখানে বনী ইসরাইলরা অনুগত ও অধীনস্ত হয়ে থাকবে। তাদের এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট একটুও বদলায়নি। যদি তারা তাদের রাজ্য পুনরুদ্ধারে জেরুজালেম ও এর আশে পাশে সফল হয়, তাহলে তারা সেই ভূমি থেকে মুসলমান, খৃষ্টান সবাইকে তাড়িয়ে দিবে। তাদের সামান্য কানাকড়িও দিবেনা বা এমনকি খেজুর গাছ লাগাবার জায়গাও দিবেনা কিংবা কোথাও কাউকে একটু পা রাখার জায়গা দেবে না।

তারা এখন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এর পূর্বেও তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল যেন অন্যদের রিজিকের পথ বন্ধ হয়ে যায়। বায়তুল মুকাদ্দাসে একজন ইহুদী স্বর্ণকার আপনার কাজ করে দিবে একজন মুসলমান বা খৃষ্টানের মজুরীর চেয়েও কম মজুরিতে, যদিও তা বাজার মূল্য থেকেও অনেক কম হয়। তাদের জনকল্যাণমূলক সংস্থা মনে হয় তাদেরকে এজন্য সাহায্য দিয়ে থাকে। এব্যাপারে পর্যাপ্ত দলিল প্রমাণও বিদ্যমান রয়েছে যে, এরা জেরুজালেমের ভূমি অধিকারের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে এবং অনান্যদের সব ধরনের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধ করার জন্য কাজ করছে। তারা এটা করেছে যখন তাদের কোন মালিকানাই নেই। কিন্তু যদি মালিকানা লাভ করে তখন?

তাদের কাছে কি রাজ্য ফিরে আসবে? আয়াতে তা সাব্যস্ত করে না, আবার নাও করে না। বরং বর্ণনা করেছে তাদের মন মানসিকতার কথা যে, তারা যদি মালিক হয় তাহলে কি করবে। এর উপর আরো অধিক আলোচনা আসবে সূরা ইসরার যার অপর নাম সূরা বনী ইসরাইলের তাফসিরে এবং এতে তাদের অধিকারের কথাও আলোচনা করা হবে। তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে টাকা পয়সা ও ধনসম্পদকে কুক্ষিগত করার ফিকিরে এবং যুদ্ধ করার ও

কৃষি ক্ষেতখামার করার প্রস্তুতি নিয়ে। এটা তাদের অনেকের মধ্যেই বেশী দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায় কিন্তু তারা ধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করে যে, তারা অবশ্যই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা পবিত্র ভূমিতেই করবে। এজন্য তারা অঢেল সম্পদ জমা করেছে আর এজন্য উসমানী সাম্রাজ্যের উপর অবশ্য কর্তব্য হল যেন তাদেরকে ফিলিস্তীনে কোন ভাবেই স্থান না দেয় এবং ভূমি মালিক হবার জন্য সহজ পথ খুলে না দেয়। তাদেরকে সেখানে হিজরত করে বেশী বেশী আসার পথ বন্ধ করে। পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় এই কিছু দিন পূর্বেও এ ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। একথা লিখেছেন শায়খ রশীদ রেজা তাঁর বিখ্যাত তাফসীর আলমানারে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৯০ বছর পূর্বে। (এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় আল-মানার পত্রিকায়, দেখুন খ. ১১, স. ১৩, ৩০ জিলকদ, ১৩২৮ হিজরী, মোতাবেক ডিসেম্বর ১৯১০ খৃষ্টাব্দ)

যায়নবাদ সর্বোচ্চ উপনিবেশবাদ ঃ

উপনিবেশবাদ তাদের মনমানসিকতা ও রক্তে মিশে আছে। এটি তাদের মানসিক রোগ, সৃষ্টিগত রোগ এবং চারিত্রিক ব্যাধি যা ইহুদী তালমূদী ব্যক্তিত্বে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে যায়নবাদ ও তার বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ হবার পর ইহুদী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বৃটিশ শাসনের সময়ে এবং ১৫ মে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পূর্বে। আরব মুসলমানদের বিরুদ্ধে এরা শত্রুতামূলক আক্রমন শুরু করে দেয়। ইসরাঈল তার যুদ্ধ ও শান্তি সর্বাবস্থায় ফিলিস্তিনে ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এদের কর্মকান্ড শয়তানকেও হার মানায়।

এই দুষ্টক্ষত ইতিহাসে সর্বনিকৃষ্ট যায়নবাদী উপনিবেশবাদের উত্থান ঘটিয়েছে। এ সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, যায়নবাদ হল সবচেয়ে উপনিবেশবাদ।

বর্তমান বিশ্ব এই অভিশপ্ত যায়নবাদী উপনিবেশ সম্পর্কে পূর্বেও জেনেছে এবং বর্তমানেও প্রত্যক্ষ করছে। সেদিকে কুরআনেও ইঙ্গিত করা হয়েছে সাবার সম্রাজ্ঞীর জবানীতে যখন তিনি বলেছিলেন,

«إِنَّ الْمُلُوْكَ إِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ج وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ».(النمل : ٣٤)

"নিশ্চয় রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিনষ্ট করে ফেলে এবং তার সম্মানিত অধিবাসীদের লাঞ্ছিত করে। তারা এ রকমই করে থাকে।" (সূরা নামল ঃ ৩৪)

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে রাজা-বাদশাহরা কোন দেশ দখল করে ঔপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। তারা সেখানে বিপর্যয় ঘটায় এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে অপমানিত লাঞ্ছিত করে থাকে। বর্তমান যুগে মানুষেরা বৃটিশ, ফরাসী, ইটালী ও হল্যান্ডের উপনিবেশ সম্বন্ধে জেনেছে। যাদের আচরণ খুবই নিকৃষ্ট ধরনের। কিন্তু যায়নবাদী উপনিবেশ হচ্ছে এসবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বর্বর। যেমনটি আমাদের ভাই ড. হাস্‌সান হাতহুত বলেন, এটা হচ্ছে সম্প্রসারণবাদী, বর্ণবাদী, সর্বগ্রাসী, সন্ত্রাসী, অত্যাচারী উপনিবেশবাদ। (এর দ্বারা আমরা আল্লাহর সাথে মিলব ঃ আরব মুসলমানদের নিকট একটি পত্র, ফিলিস্তীন অধ্যায়, লেখক ড. হাস্‌সান হাতহুত, পৃ. ১৯৫-১৯৬)

১। সর্বগ্রাসী উপনিবেশবাদ ঃ

অর্থাৎ এটা হল বসতি স্থাপনকারী উপনিবেশবাদ। এরা প্রকৃত অধিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দেয়। সেখানে বিভিন্ন দেশ হতে নিজেদের লোক এনে বসতি গড়ে দেয়া। ইহুদীরা খুবই বিব্রতবোধ করে যখন দেখে আরবদের গড় জন্মহার ইহুদীদের চেয়ে অনেক বেশী.... এরা ক্রুসেডারদের মত নয় যে, কোন দেশ দখল করলে সেটা ছেড়ে আসবে বরং তাদের উদ্দেশ্যই হল সেখানে গেড়ে বসা .... সে চায় আরবদের থেকে মুক্ত হতে বা তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করতে, তাদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ভৌগোলিক পরিবর্তনই ঘটাতেই শুধু চায় না, বরং সে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরো বেশী ইহুদীদের আনতে চায় যেন তারা ফিলিস্তিনী শ্রমিকদের স্থলাভিষিক্ত হয়। এ ভাবে রুজিতেও ভাগ বসায়। এ ব্যাপারটি পরিষ্কার করে বলেন তাদের এক বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ অধ্যাপক

বিন জীলুন ডেনুর যিনি ঘোষণা করেছেন, আমাদের দেশে দু' জাতির বসবাসের মত জায়গা হবে না।

যেমনটি বেগীনের আরব বিষয়ক উপদেষ্টা ইউরী লাবরান বলেন, আমরা আরবদেরকে হোটেলের বয়-বেয়ারা বানিয়ে ফেলবো। শীব দাউদ বলেন, হয় বৃহত্তর ইসরাইল কিংবা বৃহত্তর ইসমাঈল অর্থাৎ আরবী রাষ্ট্র যা একই পতাকা তলে সমবেত হবে আর এর অর্থ হল ইসরাইলের সমাপ্তি ঘটা।

২। সম্প্রসারণবাদী ঔপনিবেশবাদ ঃ

এটি উপনিবেশবাদের দ্বিতীয়তম চিত্র, এটি হল সম্প্রসারণবাদী উপনিবেশবাদ এর ম্যাপ এখনো সীনাগগে রয়েছে। এর সীমানা নীলনদ্র থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত। উপরে এবং নীচে সবুজ রেখা দু'টি ইহুদী মতে নীলনদ্র ও ফোরাত নদীর সংকেত। পাদ্রী গোল্ডামেইরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইসরাইল রাষ্ট্রের সীমানা সম্পর্কে। সে বলেছিল ঃ যখন আমরা সেখানে পৌছব তখন তোমাদেরকে জানান হবে। বিন জোরিওন স্পষ্ট করে বলেন, যায়নবাদী রাষ্ট্র কামনা করছে যে, তার সীমানায় থাকবে দক্ষিণ লেবানন, দক্ষিণ সিরিয়া, জর্ডান, সীনাই অঞ্চল। আর এজন্যই অসলো চুক্তিতে সীমান্ত বিষয়টি যুক্ত করা হয়নি। এটি অবশ্যই ইসরাইলী নেতৃবৃন্দের নিকট গোপন হয়েই থাকবে। তারা এটি প্রকাশ করবে না যতক্ষন না তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়।

৩। যায়নবাদী উপনিবেশ ঃ

যায়নবাদ বর্ণবাদী উপনিবেশবাদ। রাপাইল ইতান- সাবেক সেনা বাহিনী প্রধান- এক বিবৃতিতে বলেন, যারা দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা চামড়ার লোকদের বর্ণবাদী বলে অভিযুক্ত করে তারা মিথ্যুক, কালোরাই সেখানে সংখ্যালঘু সাদাদের উপর কর্তৃক করতে চায়। একেবারে পুরোপুরি আরবরা যেমন আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে চায়। যখন আফ্রিকার দেশগুলো জাতি সংঘের যায়নবাদকে বর্ণবাদী বলে সিদ্ধান্তকে ১৯৭৫ সালে ভোট দিয়ে সমর্থন করে (সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়) এর ওপর বেগীন মন্তব্য করেন

কিভাবে এটা ধারনা করা যায় যে, যারা কিছুদিন পুর্বেও গাছের ওপর বসবাস করত তারা আজ দুনিয়া চালাবে?

বরং ইহুদীদের পরস্পরের মাঝেও বর্ণবাদী অবস্থা বিদ্যমান রয়েছে কিনানী হল ইউরোপের সাদা চামড়ার ইহুদী তারা নিজেদেরকে সীফারদিমদের চেয়ে বেশী মর্যাদাবান বলে মনে করে, অথচ সীফারদিমরা ইহুদী জনশক্তির প্রায় ৭০ ভাগ লোক। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ম করে দেয়া হয়েছে শতকরা ছয় জনকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে এবং পাশ করার সময় শতকরা তিনভাগ। আর হাবশী ইহুদী যাদেরকে নিয়ে এত হৈচৈ তারা হল সমাজের নিকৃষ্টতম জীব। এমন কি স্বেচ্ছায় রক্ত নেয়ার সময় হাবশী ইহুদীদের রক্ত নিয়ে তা ফেলে দেয়া হয় যেন তা ব্যবহার না করা হয়। যখন এ ঘটনা ফাঁস হয়ে যায় তখন হাবশী ইহুদীদের মাঝে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তারা নিজেদেরকে নিগৃহীত বলে মনে করতে থাকে এবং বর্ণবাদের শিকার বলে মনে করে। তাদেরকে এক বলে মনে করলেও তাদের অন্তর সমূহ বিক্ষিপ্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বরং অর্থডিক্স ইহুদীরা সম্প্রতি এক ফত্ওয়া জারী করেছে সংরক্ষণবাদীরা এবং সংস্কারবাদী ইহুদীরা প্রকৃতপক্ষে ইহুদী নয়।

৪। অত্যাচারী উপনিবেশবাদ ঃ

এটি এখন বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সুস্পষ্টভাবে এটি একটি অত্যাচারী উপনিবেশবাদ। কিন্তু আমরা চাই তাদের ঘরের একজন এ ব্যাপারে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াক। অধ্যাপক গোডা মাজেন্স হিব্রু ইউনিভার্সিটির প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর। তিনি বলেন ইহুদীদের বিশ্ববাসীর নিকট সুবিচার চাওয়ার অনেক অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমি মোটেই প্রস্তুত নই আরবদের উপর অত্যাচার চালিয়ে ইহুদী অধিকার পেতে। বেনামীন কোহেন তেলআবীব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি বলেন, ইহুদীরা সর্বদা কঠিন অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছে তারা কিভাবে এই অত্যাচারের ওপর থাকতে পারে? অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন। বর্তমানে আমেরিকায় দুটি বড় আন্দোলন রয়েছে যার নাম হল শান্তি।

ফিলিস্তিনীদের ওপর বর্তমান পরিচালিত জুলুমকে তারা অপছন্দ করে। তারা মনে করে যে, ফিলিস্তিনীদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র দেয়া দরকার এবং তাদের সাথে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণের মাধ্যমে বসবাস করা প্রয়োজন। এ মতের পক্ষে ফিলিস্তীনের অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক ইহুদী রয়েছে।

৫। সন্ত্রাসী উপনিবেশ ঃ

এটি তেমনি সন্ত্রাসী উপনিবেশবাদ। এটি একটি খুবই স্পষ্ট বিষয়। সন্ত্রাস হল এর রক্তমাংসে জড়িত। সন্ত্রাসই হল এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ। তারা বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপের জন্ম দিয়েছিল। যেমন হাজানাত, অর্জন, এস্টন এরা অসংখ্য হত্যাকান্ড ঘটায়। সন্ত্রাসই হল ইহুদী রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই করেছে লোহা ও আগুন দিয়ে। তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে নারী, শিশু, বৃদ্ধাকে, যার কোন নজির ইতিহাসে নেই এমনকি পেট ফেড়ে দেখেছে যে, গর্ভের শিশু ছেলে না মেয়ে? এ নিয়ে বাজি ধরেছে আর হাসাহাসি করেছে কে বাজিতে জিতছে? এরপর শিশু ও তার মাকে হত্যা করেছে।

সন্ত্রাসই এ রাষ্ট্রকে সম্প্রসারিত করেছে তাকে বিভক্তির সিদ্ধান্তের চেয়েও অনেক বেশী। এরপর ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরো অনেক ভূমি নিজের সাথে যুক্ত করে নিয়েছে।

সন্ত্রাসই আরব প্রতিবেশীদেরকে হুমকীর মধ্যে রেখেছে। শুধুমাত্র সেই একমাত্র পারমাণবিক শক্তির অধিকারী থাকবে এজন্যই ইতিপূর্বে সে ইরাকের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে একে ধ্বংস করে দিয়েছে। বরং সে এই পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে আরবের সম্ভাবময় যুবকদেরকে হত্যা করছে, বিষয়টি একাধিক ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে। বরং সে সমস্ত মুসলমানদেরকেই হুমকী দিচ্ছে যদি কেউ এর জন্য প্রচেষ্টা চালায় যেমনটি লক্ষ্য করা যায় পাকিস্তানের পারমানবিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা চালাবার সময়। এ সময় তার প্রতিবেশী ভারতের সাথে যুক্ত হয়ে ইসরাইল পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার উপর আক্রমন চালাবার পাঁয়তারা করেছিল।

সন্ত্রাসের মাধ্যমে হত্যা করা হচ্ছে সেসব লোকজন ও নেতৃবৃন্দকে যারা নিজেদের ভূমি রক্ষার জন্য, দেশ ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে। যেমন দেখলাম শালাকী, আইয়াশ শারীফ প্রমুখদের হত্যা করতে এবং মাশআলকে হত্যা প্রচেষ্টায়।

যায়নবাদী সন্ত্রাসই বহু পূর্বে ইয়াফা মসজিদে মুসল্লীদের হত্যা করেছে, সে দীরে ইয়াসীনে গণ হত্যা চালিয়েছে। ইহুদীরাই বাহরুল বাকার স্কুলে ছাত্রদেরকে নির্বিচারে হত্যা করে, আর এই সন্ত্রাসী পদক্ষেপের মাধ্যমে রমজান মাসে ফজরের নামাজে খলিলী মসজিদের মুসল্লীদের ওপর ব্রাশ ফায়ার করে হত্যাকান্ড চালায়। এই সন্ত্রাসীরাই হত্যা করে সুড়ঙ্গ পথের পথচারীদের। হত্যাকান্ড চালিয়েছে লেবাননের কানা অঞ্চলে। আর সম্প্রতি খলিলে নিরাপরাধ শ্রমিকদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। একের পর এক হত্যাকান্ড চালিয়েই যাচ্ছে আর তার হাত রক্তে রঞ্জিত হতেই আছে নির্দোষ লোকদের রক্তে।

আশ্চর্য! সে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, আর সে যায়নবাদী প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, 'মুসলমানরা সন্ত্রাসী'। কিন্তু সে যেন এসব অভিযোগ থেকে নির্দোষ! ঠিক যেন ইউসুফকে (আ.) কূয়ায় নিক্ষেপকারী ভাইদের মত নির্দোষ!?

যায়নবাদ সারা বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক

প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। কারণ যে যায়নবাদী ইহুদীরা শুধুমাত্র মুসলমান বা আরবদের জন্যই বিপজ্জনক নয় বরং এটি গোটা বিশ্ব এবং গোটা মানবতার জন্য বিপজ্জনক। এটি সন্ত্রাস ও উগ্রতাকে আত্মস্থ করে সমস্ত ধর্মের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে লেগেছে। এই চিন্তাধারায় তাদেরকে লালিত করেছে তালমুদের বিপজ্জনক শিক্ষা। এটি যেমন খৃষ্টীয় ধর্মের জন্য বিপজ্জনক তেমনি ইসলামের জন্যও। আমরা ইহুদীদের খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে মতামত এবং খৃষ্টানদের ইহুদীবাদ সম্পর্কে অভিমত তুলে ধরতে চাই যেন আমাদের নিকট বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

ইহুদীবাদ খৃষ্টবাদ সম্পর্কে কি বলে?

উস্তাদ মুহাম্মদ সাম্মাক তাঁর "ইঞ্জিলীয় মৌলনীতি বা যায়নবাদী খৃষ্টবাদ এবং আমেরিকার অবস্থান" নামক গ্রন্থে এ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, ইহুদীর জন্য অনুমতি রয়েছে যে, সে খৃষ্টানকে ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারে। সুতরাং প্রভুর নাম অপবিত্র হবে না যখন খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া হবে। ইহুদীর ওপর অবশ্য কর্তব্য হল সর্বদা সে খৃষ্টানদের প্রতারিত করার জন্য চেষ্টা করবে।

যে ব্যক্তি খৃষ্টানদের জন্য কোন ভাল কাজ করবে সে কবর থেকে কখনো উঠতে পারবে না।

"…. এখন আমাকে অবকাশ দিন আমি আপনাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে, কিভাবে আমরা এত দ্রুত ক্যাথোলিক গীর্জার পিঠে সওয়ার হতে সক্ষম হলাম। আমরা অতি সংগোপনে তাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে আমাদের দলে ভিড়াতে সক্ষম হই। তারা আমাদের পক্ষে কাজ করে আমাদের আন্দোলনের পক্ষে হয়ে যায় এবং আমাদের স্বার্থের কাজ করে যায়।

আমরা আমাদের কিছু ছেলেদের নির্দেশ দেই ক্যাথলিকদের বডিতে ঢুকে

যাবার জন্য। বিশেষ নির্দেশনা সহকারে যে অবশ্যই অতি সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে হবে এবং গীর্জাকে যেন তার অন্তরেই মেরে ফেলা যায় সে ধরনের কর্মকান্ড চালাতে হবে, আভ্যন্তরীন অপকর্ম সৃষ্টি করে তা ফাঁস করে দেয়ার মাধ্যমে। এর দ্বারা আমরা আমাদের ইহুদীদের নেতার উপদেশই পালন করলাম যিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে উপদেশ দিয়েছিলেনঃ তোমরা তোমাদের কিছু সন্তানকে পাদ্রী ও পুরোহিতের কাজে নিয়োগ কর, যেন তারা তাদের গীর্জাকে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সব ইহুদী সন্তানই তাদের অঙ্গীকার পুরা করতে সক্ষম হয়নি। অনেকেই তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে খিয়ানত করেছে। কিন্তু অন্যরা তাদের অঙ্গীকারের হেফাজত করেছে এবং তাদের দায়িত্ব আমানত ও সম্মানের সাথে পালন করেছে।

আমরাই পৃথিবীতে সংগঠিত সকল বিপ্লবের জনক। এমনকি যে সব বিপ্লব মাঝে-মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে ঘটে থাকে এবং আমরাই কোন রকমের দ্বিধা দ্বন্দ ছাড়াই যুদ্ধ ও শান্তির নেতা। আমরা বলতে পারি যে, আমরাই খৃষ্টীয় ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করি। এর নীতিনির্ধারকদের একজন আমাদের সন্তান ইহুদী অরিজিন। তাকে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ইহুদী দায়িত্বশীলদের প্ররোচনা এবং ইহুদী সম্পদ দিয়ে সাহায্য সহায়তা করার মাধ্যমে। এরফলে ধর্মীয় সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। যেমনটি মার্টিন লুথার তার ইহুদী বন্ধুদের দিক নির্দেশনায় করেছে। সেখানে তার প্রোগ্রামসূচী সফলতা লাভ করেছে ক্যাথলিক গীর্জার বিরুদ্ধে, ইহুদী দায়িত্বশীলদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনায় এবং তাদের আর্থিক সহযোগিতায়।

আমরা প্রোটেস্টান্টদের ধন্যবাদ জানাই তাদের আন্তরিকতার জন্য আমাদের ইচ্ছা পূরণে, যদিও তাদের অধিকাংশই যারা তাদের ওপর একনিষ্ঠ ঈমান পোষণ করে, আমাদের জন্য একনিষ্ঠ হয়নি। আমরা তাদের সহযোগিতার জন্য খুবই কৃতজ্ঞ যা তারা খৃষ্টীয় দূর্গের বিরুদ্ধে করেছে। আর এটি হচ্ছে গোটা বিশ্বের ওপর কর্তৃক প্রতিষ্ঠার স্থানে পৌছার প্রস্তুতি। আজ পর্যন্ত আমরা ইউরোপের অধিকাংশ সংস্থা ও সংগঠনকে পাল্টিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি, আর নিঃসন্দেহে অবশিষ্টগুলো আমাদের মুঠোয় চলে আসবে। রাশিয়া আমাদের চলার পথ করে দেয়ার জন্য ভূমিকা রেখেছে। আর ফ্রান্সের মাসুনী সরকার আমাদের হাতের

আঙ্গুলের নিচে। ইংল্যান্ড ক্যাথলিক গীর্জাকে খতম করার ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। স্পেন ও মেক্সিকো তো আমাদের হাতের পুতুল। আরো এ ধরনের অনেক রাষ্ট্র রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জালে আটকা। বিশ্বের অধিকাংশ পত্রিকাই আমাদের কর্তৃত্বের অধীনে কাজ করছে। এর দ্বারা আমরা বিশ্বব্যাপী ক্যাথলিক গীর্জার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছি।

আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাবার জন্য। আমরা সাধারণ লোকদের নিজস্ব জাতীয়তার প্রতি ঘৃণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছি এবং পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করার জন্য উৎসাহিত করছি। আর ধর্মকে তুলে ধরছি সময় নষ্টকারী বিষয় বলে এবং এটি পূর্ব যুগের বিষয় এখন বর্তমান যুগের সাথে এটি চলনসই বা সামঞ্জস্যশীল নয়। আমরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ইহুদীদের প্রতীক্ষিত রাষ্ট্র বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, প্রথমে রোম সিংহাসন থেকে পোপকে তাড়াতে হবে এবং বিশ্বের সকল রাজা বাদশাদের গদিচ্যুত করতে হবে। (প্যারিসের বেনাপোর্ট কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা, ক্যাথলিক গেজেট, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৬ খৃ.)

খৃষ্টবাদ ইহুদীবাদ সম্পর্কে কি বলে?

খৃষ্টবাদ ইহুদীবাদ সম্পর্কে কি বলছে? সে সম্পর্কে কতিপয় প্রমাণাদি তুলে ধরছিঃ

উস্তাদ সাম্মাক যে কথা উল্লেখ করেছেন আমরা তা এখানে লিপিবদ্ধ করছি, "ইহুদীবাদকে সমস্ত বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করা হয় বিশেষ করে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য। যে শক্তি বিগত ১৯০০ বছর ধরে খৃষ্ট ধর্মের চামড়া তুলেছে সে আজ তার গীর্জার চামড়া তুলার চেষ্টা করছে। আজ এই যুগে সে খৃষ্টানদের উপর বিরাট যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে যার পরিণতি অচিরেই নির্ধারিত হবে জীবন অথবা মৃত্যু। কিন্তু অধিকাংশ খৃষ্টান নেতা সে ব্যাপারে সতর্ক নয়। বিশ্ব ইহুদী সমাজতন্ত্রবাদ দুনিয়ার জাতি গোষ্ঠীকে অধীনস্ত করেছে, সে এখন সুযোগ খুজছে খৃষ্টবাদকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য। (পাদ্রী ইরডাব ও ইয়ারোড, খৃষ্টানদের ওপর ইহুদী আগ্রাসন, পৃ. ৬)

যীশুকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা সবই প্রভুর ওহী দ্বারা। ইহুদীদের নিকট থেকে নয়। আমাকে গবেষণার জন্য অনেক ইহুদী গ্রন্থ ঘাঁটতে হয়েছে কিন্তু এতে এমন কোন লাইন পেলাম না যাতে যীশু সম্পর্কে সামান্যতম মানবিক সহানুভূতি রয়েছে .... আমি স্বীকার করছি যে, আমি একাজ করার পূর্বে এ ধরনের কোন ধারনাই করতে পারিনি যে, এসব গ্রন্থের পাতায় যীশু সম্পর্কে কোন সম্মানই দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি এখন জেনেছি যে, কোন ইহুদী যদি এ ধরনের মহান অনুভূতি উপলব্ধি করে তাহলে সাথে সাথেই তার ইহুদীত্ব চলে যাবে এবং সে একেবারে ইহুদী থেকে বের হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে মুহাম্মদের কুরআনে অনেক চিন্তাধারা পাওয়া যায় তাতে যীশু খৃষ্ট ও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গভীর সম্মান ব্যক্ত করে। কুরআনে একটি সূরা রয়েছে যীশুর পরিবার সম্পর্কে যার নাম হল সূরা আলে ইমরান। অন্যটি তার মায়ের নামে (সূরা মরিয়ম) আর তৃতীয়টি সূরা মায়েদা যাতে তাঁর মুজেজার কথা বলা হয়েছে যা বাইবেলেও উল্লেখ করা হয়নি। আর অনেক আয়াত রয়েছে বিভিন্ন সূরাতে যাতে যীশু, তাঁর গ্রন্থ এবং তাওহীদের প্রতি তাঁর দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে)।

উনবিংশ শতাব্দীর এক ইহুদী লেখক যীশুকে চিত্রিত করেছে এই বলে, "সে নতুন শিশু মৃত্যু মাথায় করে জন্ম নিয়েছে।" ক্রুস সম্পর্কে বলেন, "ইহুদীদের কোন প্রয়োজনই নেই এ ধরনের প্রতীকী জিনিসের যা এক অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি করে .... তাদের ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধির জন্য।" বরং এর চেয়েও আরো বিপজ্জনক কথাবার্তা রয়েছে। ১৮৮০ সালে এক স্পেনীয় ইহুদীর একটি বই প্রকাশিত হয়। তার নাম হল মুসা ডোলিয়ন। সে উক্ত গ্রন্থে যীশুকে বলে, "সে হল মৃত কুকুর এবং সে গোবরের নর্দমায় প্রথিত।" উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইহুদীরা হিব্রু ভাষায় কিছু বই পুস্তক প্রকাশ করে যাতে তারা তালমুদের গোপন কিছু লেখা প্রকাশ.করে যেন তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্বেষ ছড়ায়। হিব্রুভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় প্রকাশিত বইপত্রে যীশু সম্পর্কে সেসব বিশেষণ বাদ দেয়া হয়। যেমন পাগল, যাদুকর, অপবিত্র, কুকুর, অবৈধ সন্তান, মূর্তি পূজক, জারজ সন্তান ...... ইত্যাদি এবং তাঁর পূত-পবিত্র কুমারী মা সম্পর্কে অশালীন কথাবার্তাও। (হেস্টীন ইস্টুয়ার্ড চ্যাব্রীলন, উনবিংশ শতাব্দীর মৌলনীতি, খ ১, পৃ. ৩৩৭)

তালমুদে কুফরী, নাস্তিকতা ও কদর্য কথাবার্তায় ভরপুর। (নবম পোপ গ্রেগোরী এর ঘোষণা ১২৪২ খৃষ্টাব্দ)

আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বের বড় বড় সাহিত্যিক রক্তচোষা ইহুদী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। যেমন আমরা দেখতে পাই সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত "মার্চেন্ট অব ভেনিস" নাটকে। তেমনি আমরা দেখতে পাই রাশিয়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক ফিডোরা ইয়াসতুফস্কীর ইহুদী বিষয়ে অবস্থান। যেমনটি জওয়াফফা দায়লামী অনুবাদ করেছেন পুস্তিকা আকারে বইটি প্রকাশ করেছে ইবনে রুশদ প্রকাশনী। বনী ইসরাইলরা তাওরাতের আল্লাহর বাণীকে পরিবর্তন করেছে এবং এতে কম বেশী করেছে। এমন কি তা বিকৃত করেছে এবং নিজেদের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করেছে এবং দুনিয়াবী স্বার্থে ব্যবহার করেছে এবং বর্ণবাদী উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে। কুরআন কারীমে এ বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

«فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيْثَاقَهُمْ لَعَنّٰهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْبَهُمْ قَاسِيَةً ج
يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ».

"তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে তাদেরকে আমরা অভিসম্পাত করি এবং তাদের অন্তরকে কঠিন করে দেই। তারা (আল্লাহর) বাক্যকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করিয়ে দিত এবং তাদেরকে যে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল তা তারা ভুলে গিয়েছিল ...।" (সূরা মায়েদা ঃ ১৩)

তারা ধারনা করে যে, তারাই হল পবিত্র গ্রন্থের উম্মত। কিন্তু কোথায় সেই পবিত্রগ্রন্থ যা আল্লাহ মুসার (আ.) ওপর নাজিল করেছিলেন আলোকবর্তিকা হিসেবে এবং মানুষের জন্য হিদায়েত হিসেবে?

এমনকি বর্তমান গ্রন্থটিকে এত পরিবর্তন করা সত্ত্বেও সেটিকে তারা গ্রহণ করছে শুধুমাত্র এ গ্রন্থ দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সাধন হয় এবং লক্ষ্য হাসিল হয়। তাদের পরিচয় কুরআনে এভাবে চিত্রিত করেছে যে, তারা কিতাবের কিয়দাংশের উপর ঈমান আনে এবং কিয়দাংশকে অস্বীকার করে।

কিতাব বলছে ঃ তোমার সর্বান্তকরণ দিয়ে আল্লাহকে ভালবাস এবং সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তাকে মহব্বত কর। কিন্তু তারা নিজেদের জীবনকে এবং

নিজেদের স্বার্থকেই ভালবাসে। তারা কিতাবের সে অংশকেই বুঝে যে অংশে বাপ-দাদারা উগ্রতা, কঠোরতা, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ছিল এবং অন্যান্য জাতির সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়েছিল বিশেষ করে কেনানীদের। তারা শুধু সেটুকুই জানে যাতে তাদের বর্ণবাদকে সমর্থন করে যে বনী ইসরাইল হল আল্লাহর পছন্দনীয় জাতি এবং অন্যদের এর চেয়ে কম মর্যাদা দেয় বরং এদের কাউকে কাউকে তারা চিরদিনের জন্য দাস করে নেয়।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ ইসরাইলীদের একে অপরকে হত্যা করা এবং একে অপরকে যেন ঘর থেকে বের করে দেয়া নিষিদ্ধ পক্ষান্তরে তা ইসরাইলীদের জন্য বৈধ বরং ওয়াজিব হল অন্যান্য জাতিকে আক্রমণ করা বিশেষ করে কেনানীদেরকে। আর তাদের ওপর ওয়াজিব হল কোন দেশ বিজয় করার পর প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের তলোয়ার দ্বারা গর্দান উড়িয়ে দেয়া। তাদের কোন একজনকে বাঁচিয়ে রাখা হবেনা এবং তাদের সন্তান ও নারীদেরকে দাসদাসী বানিয়ে নিতে হবে। তাদের ধনসম্পদ যা কিছু আছে তা হস্তগত করে নিতে হবে বা "সব লুটপাট করে নিতে হবে" তাদের আসফারের ভাষ্য মতে। (তাসনিয়া ২০/১৩,১৪)

বরং তাদের আসফার সমূহ স্বীকার করে যে, কেনানী সম্প্রদায়ের জন্য পূর্বেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল যে, তারা বনী ইসরাইলের দাস হবে। আর ঐ জাতির কারো কোন কাজই হবে না এই দাসত্ব ছাড়া। যদি তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা স্বাধীনতা কামনা করে তাহলে বনী ইসরাইলের ওপর ওয়াজিব হবে তাদেরকে তরবারী দিয়ে ফয়সালা করা। তাদের আসফার সমূহ এই অবস্থার কথা এ বলে স্বীকৃতি দেয় যে, এটা নুহ (আ.) এর দু'আর পরিপ্রেক্ষিতেই কেনানীদের ওপর ফরজ করা হয়েছে। এটা যদি তাওরাতের আসফারে হয়ে থাকে তাহলে তা তলমুদে কি হতে পারে যাতে অইহুদীদেরকে গবেট বলা হয়েছে যারা চতুস্পদ জন্তু এবং কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট?

আরব খৃষ্টানদের ইসরাইলী মানবাধিকারের ব্যাপারে অবস্থান হল তারা ইসরাইলের বর্বরতার নিন্দা করে এবং জমিনের বুকে তাদের বিপর্যয় সৃষ্টির তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

আমি বৈরুতে মুসলমান ও আরব খৃষ্টানদের এক সম্মেলনে যোগদান করি। এ সম্মেলনটির শিরোনাম ছিল "জেরুজালেমের জন্যই মুসলমান ও খৃষ্টানরা একত্রে কিছু করতে পারে।"

আমি এতে অনেক বিশিষ্ট খৃষ্টান সাহিত্যিকের জোরালো বক্তব্য শুনেছি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পোপ কাবুটগি- জেরুজালেমের প্রধান পাদ্রী- যাকে ইসরাইল সেখান থেকে বিতাড়িত করেছে এবং ইস্কান্দারিয়ার লোক আনবা শানুদাহ মিসরের কিবতী গীর্জার প্রধান যিনি বেশ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। অন্যান্যরাও জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন।

এদের মধ্যে অনেকেই আবার তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন যার ধর্মীয় ও জ্ঞানগত মূল্যমান রয়েছে।

আসুন আমরা দেখি পোপ পোলিশ হান্না মাসআদ তাঁর "যায়নবাদী শিক্ষার বর্বরতা" নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ "খৃষ্টানদের রয়েছে ইঞ্জিল যা গোটা বিশ্বকে সুসংবাদ দেয়। আর মুসলমানদের রয়েছে কুরআন যা সমস্ত জাতি গোষ্ঠির মাঝে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু ইসরাইলের রয়েছে দুইখানা গ্রন্থ। একটা খুবই পরিচিত যার ওপর তারা আমল করে না সেটি হল তাওরাত, আর অন্যটি যা বিশ্ববাসীর নিকট অজানা, যাকে তারা তালমুদ বলে। একে তারা অন্যটির ওপর প্রাধান্য দেয় এবং তা গোপনে পাঠ করে থাকে। এটিই সকল বিপদের মূল।" আমরা আলোচনা করেছি যে, বর্ণবাদ ইহুদীর নিকট এমন অংশ যা তা থেকে কোন ক্রমেই বিভাজ্য নয় এবং বিশ্ববাসী গর্দভ ও ইহুদী এই দু'ভাগে বিভক্ত। ইহুদীরা হল উত্তম ও পছন্দনীয় আর অন্যরা হল গর্দভ, নিকৃষ্ট এবং অন্যদের অর্থাৎ গর্দভদের সবকিছু বৈধ করে নেয়া তাদের দীনেরই একটি অংশ।

আল্লাহর জাত (সত্ত্বা) স্বয়ং তাদের নিকট বর্ণবাদী। পোপ পোলিস হান্না বলেন, খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সকলের পিতা এবং মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক, কিন্তু যায়নবাদীরা চায় যে, প্রভু হবে তাদের একার জন্য। এজন্যই তারা প্রভুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলে, তিনি 'ইসরাইলের প্রভু।' (যায়নবাদী শিক্ষার বর্বরতা, পোপ পোলিশ হান্না, ইসলামী লাইব্রেরী বৈরুত পৃ-১০)

প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ইহুদীদের সম্পর্কে সতর্ক করেন ঃ

রাজনীতিবিদদের মধ্যে যারা তাদের প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা দ্বারা তাদের সমাজের জন্য ইহুদীবাদের বিপজ্জনকতা সম্পর্কে আঁচ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন।

অষ্টাদশ শতকে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলি এক সরকারী দলিল প্রণয়ন করেন যাতে তিনি আমেরিকাবাসীকে ইহুদীবাদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এটি আমেরিকার সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত এক বক্তব্যে তিনি সতর্কতা প্রদান করেন। এতে তিনি বলেন, এক মহাবিপদ আমেরিকাকে বিপন্ন করে তুলছে তা হল ইহুদী বিপদ। কেননা ইহুদীরা যে দেশেই গেছে সেখানেই তারা জাতীয় পর্যায়ে চরিত্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতাকে শেষ করে দিয়েছে। তারা এমন ধরনের লোক যারা সকলের সাথে মিলেমিশে চলতে জানে না। তারা সতেরশ বছর ধরে নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। কেননা তারা তাদের বাপ-দাদাদের দেশ থেকে বিতাড়িত। যদি তাদেরকে ফিলিস্তীন ফিরিয়েও দেয়া হয় তবুও তারা সবাই সেখানে যাবে না। কেননা তারা পরগাছা। একে অপরের সাথে বসবাস করতে পারে না। তাদেরকে অবশ্যই খৃষ্টান ও অন্যান্যদের সাথে বসবাস করতে হবে যারা তাদের জাত নয়। যদি এই ইহুদীদেরকে সাংবিধানিক বিধি করে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া না হয় তাহলে একশ বছরের মধ্যেই এ দেশে তাদের ঢল নামবে এবং তারা আমাদের জাতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে একে ধ্বংস করে দিতে সমর্থ হবে।

তারা আমাদের শাসন পদ্ধতি পরিবর্তনে সক্ষম হবে যার জন্য আমরা আমাদের জান-মাল, জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছি একশ বছর যেতে না যেতেই অবস্থা এমন হবে যে আমাদের নাতী-পুতিদের ইহুদী খামারে ও ফার্মে কাজ করতে হবে। সে সময় অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করবে ইহুদীরা। যদি আমেরিকানরা ইহুদীদের শেষ পর্যন্ত বিতাড়িত না করে তাহলে তাদের ছেলে সন্তানরা তাদের কবরে গিয়ে অভিসম্পাত করবে। ইহুদীরা আমেরিকানদের মত উত্তম চরিত্রের পরিচয় দিতে পারবে না যদিও তারা আমেরিকানদের মাঝে দশ পুরুষ অবস্থান করে। কেননা নেকড়ে তার স্বভাবকে কোনদিনই ভেড়ার স্বভাবে পরিণত করতে পারে না। ইহুদীরা আমেরিকার জন্য

বিপদ জনক, যদি তাদেরকে এতে প্রবেশের স্বাধীনতা দেয়া হয়। তারা আমেরিকার সকল প্রতিষ্ঠানের দফারফা করে ছাড়বে। এজন্যই সাংবিধানিকভাবে তাদেরকে বিতাড়িত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অষ্টাশত শতকের বক্তব্যে যে কথা এসেছে আজকের দিনে তা ইহুদীদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। তারা আজ আমেরিকার অর্থনীতির ওপর এবং আমেরিকার রাজনীতির ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন যে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন আমেরিকার জনগণের ব্যাপারে তা আজ বাস্তবে পরিণত হয়েছে। (দেখুন পবিত্র জেরুজালেম, ইঞ্জিনিয়ার রায়েফ ইউসুফ আজম, পৃ. ৩১-৩২)

আজ ইহুদীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র আঁটছে তা আরো বড় ভয়ানক। প্রাচীন আরবী কবি বলেছেনঃ

অনাগত দিনই তোমার জন্য প্রকাশ করবে যে সম্পর্কে তুমি ছিলে অজ্ঞ

এমন লোকও তোমাকে সংবাদ নিয়ে দিবে যাকে তুমি কোন খরচাপাতিও দাওনি।

অন্য আরেক কবি বলেন,

আমি তাদেরকে আমার কথা বলেছিলাম চলার পথে

কিন্তু আমার উপদেশ বুঝেছে সবকিছু ঘটে যাবার পরে।

আমেরিকা ও ইসরাইল

ইসরাইল প্রতিষ্ঠার কোন নৈতিক, ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। সে এক ভুঁইফোড় রাষ্ট্র যা গায়ের জোরে শক্তির দাপটে রক্ত ও বারুদ ঝরিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আরব ও মুসলমানদের দুর্বলতা অনৈক্যের সুযোগকে কাজে লগিয়ে এবং উপনিবেশবাদী শক্তির ছত্রছায়ায় ও মদদে বিশেষ করে উপনিবেশবাদী শক্তি খৃষ্ট ধর্মে বিশ্বাস করে যা আবার ইহুদীদের আসফার ও অন্যান্য গ্রন্থকে বিশ্বাস করে যদিও এতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়েছে। পশ্চিমারাই হল ইসরাইল তৈরীর হোতা এবং একে অস্ত্র ও সম্পদ দিয়ে সাহায্য-সহায়তাকারী যেমন- পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা কিংবা লোকবল দিয়ে সহায়তাকারী, যেমন- রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ।

যদি না পশ্চিমের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার এবং আমেরিকার আর্থিক সহযোগিতা এবং আমেরিকার অব্যাহত সামরিক সাহায্য এবং রাজনৈতিক সমর্থন (যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ভেটো), ইসরাইলের জন্য না দেয়া হত তাহলে এটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সামনে এগুতে পারত না।

এই নাটকের সর্বশেষ যেটা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম সেটি হল, আমেরিকান দূতাবাস তেলআবিব থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তর এবং এজন্য ১০০ (একশ) মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ। এজন্য আমেরিকান পার্লামেন্টে এক উদ্ভট প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। প্রখ্যাত সাংবাদিক আহমাদ ইউসুফ আলকারআ 'আল-আহরাম' পত্রিকায় এর সমালোচনা করে বলেন, আমেরিকান পার্লামেন্টে ১০ ই জুনের সিদ্ধান্ত নিছক রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া কিছুই নয়। অন্যান্য বিষয়ের মতই আমেরিকান দূতাবাস ভবন স্থানান্তর ও এর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা। কংগ্রেসম্যানরা কথিত কতিপয় উদ্ভট দাবী ও মিথ্যা ঐতিহাসিক দাবীর অজুহাত তুলে বলে যে, জেরুজালেমকে আরবী করণ করা করা হয়েছিল, আর এজন্য

দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তরের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। আর এজন্য অর্থ অনুমোদনও করা হয়। মানুষ আশ্চর্য হচ্ছে যে, আমেরিকার মত এক পরাশক্তি কিভাবে তার পার্লামেন্টে এ ধরনের উদ্ভট ও মিথ্যা বিষয়কে লিপিবদ্ধ করতে পারে।

কংগ্রেস যে ঐতিহাসিক ভ্রান্তির বেড়াজালে পড়েছে তার প্রথম উদাহরণ হচ্ছে ইসরাইলের রাজধানীর জন্য জেরুজালেমকে নির্বাচন। অথচ জেরুজালেম হচ্ছে জরবদখল করা ভূমি এবং এটি যুদ্ধ আইনের আওতায় পড়ে।

কংগ্রেস তার ঐতিহাসিক অজ্ঞতার কথা জোর দিয়েই প্রমাণ করেছে তার প্রথম ও দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে। সে ধারনা করেছে ১৯৪০ সাল থেকেই জেরুজালেম ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে ছিল এবং বর্তমানেও আছে, যদিও নির্ধারণ করেনি কোন জেরুজালেম তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

এরপর আমাদেরকে কংগ্রেসের চার নং থেকে আট নং সিদ্ধান্ত বিস্মিত ও হতবাক করেছে যাতে মিথ্যা ধর্মীয় দাবী তোলা হয়েছে। আমরা পাঠকদের সামনে তা তুলে ধরছি।

৪। জেরুজালেম শহর হলো ইহুদীদের আধ্যাত্মিক সেন্টার এবং এ শহরটি প্রতিটি ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্যও।

৫। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত জেরুজালেম শহর ছিল বিভক্ত। সবধরনের ধর্মীয় মতবাদ সম্পন্ন ইসরাইলী জনগণকে এবং অন্যদেশে বসবাসরত ইহুদীদেরকে পবিত্র স্থান সমূহে প্রবেশ করতে দেয়া হত না, যা ছিল জর্দানের কর্তৃত্বে।

৬। ১৯৬৭ সাল থেকেই জেরুজালেম শহরকে ঐক্যাদ্ধ করা হয়েছে গন্ডগোলের সময় যা ছয়দিনের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

৭। ১৯৬৭ সাল থেকে জেরুজালেম ঐক্যবদ্ধ শহর হিসেবে ছিল এবং এখনও আছে, যা পরিচালনা করছে ইসরাইল। এতে সবার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে শহরের ভিতর বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসীদের পবিত্রস্থান সমূহ প্রবেশ করার ক্ষেত্রে।

৮। এবছর ১৯৯৫ সাল হচ্ছে আঠাশতম বছর যাতে ক্রমাগতভাবে দেখা যাচ্ছে, জেরুজালেম ঐক্যবদ্ধ শহর হিসেবে ছিল, আছে এবং পরিচালিত হচ্ছে যাতে সকল ধর্মের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হচ্ছে এবং তা সম্মানের সাথে দেখা হচ্ছে।

কংগ্রেস এ ধরনের মিথ্যাচার ও উদ্ভট দাবীর দ্বারা জেরুজালেমকে ইহুদীদের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র বানিয়ে ফেললো, অন্যান্য আসমানী ধর্মকে বাদ দিয়ে। এবং ইসরাইলীদেরকে পবিত্রস্থান সমূহের একমাত্র হেফাজতকারী হিসাবে দাবী করল এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রবেশের স্বাধীনতা রক্ষাকারী হিসেবে।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইসরাইল কর্তৃক জেরুজালেমকে তিন দশক ধরে দখল করে রাখার ঘটনা প্রবাহ ১৯৬৭-১৯৯৭ পর্যন্ত কংগ্রেসের এই বিভ্রান্তির জবাবে যথেষ্ট। এটি একেবারে দিবালোকের মত স্পষ্ট।

আমরা এখানে একাধিক ঘটনা প্রবাহ লিপিবদ্ধ করছি যেন, কংগ্রেস সদস্যরা বুঝতে পারে যে, তারা ইসরইলের পক্ষে কত মিথ্যাচারে লিপ্ত রয়েছে।

সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনার শুরু হয়েছিল মসজিদুল আকসাকে ইসরাইল কর্তৃক পুড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা (১২ই আগষ্ট ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ) থেকে। এই প্রচেষ্টা হল মসজিদুল আকসাকে ধ্বংস করার নীল নকসার শুরু। এ প্রচেষ্টার পূর্বে তারা মসজিদের তলদেশ ও এর আশেপাশে গভীর খননকার্য শুরু করে কথিত সোলাইমানের স্তম্ভের সন্ধানে যা প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে ধ্বংস হয়েছে এবং পর্যটন সুড়ঙ্গ স্থাপন এর পূর্বে তারা মসজিদুল আকসা সংলগ্ন ইসলামী ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো অধিগ্রহণ করে নেয়।

এসবই প্রমাণ করে যে, মসজিদুল আকসাকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংস করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইসরাইলের হারটেন্স পত্রিকা প্রশ্ন তুলে (২৮ মার্চ ১৯৮২ সালে) মসজিদুল আকসা ও কুব্বা সাখরা ধ্বংস করা কি এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র? পত্রিকার প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়ঃ ইসরাইল সরকার চরম মৌলবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠীয় আন্দোলনের পক্ষে তার সবুজ গম্বুজ ধ্বংস করার পরিকল্পনা আড়ালে রেখেছে এবং এর ধ্বংস্তুপের ওপর তৃতীয় স্তম্ভ স্থাপন করার পরিকল্পনাও তাদের

রয়েছে। পত্রিকাটি এ প্রশ্ন তুলেছে যখন লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় এবং ইঙ্গিত করে যে, মেনাহিম বেগীন ক্ষমতা গ্রহণের সময় ধর্মপ্রাণ লোকদের নিকট ওয়াদা করেছিলেন ১৯৭৭ সালে যে, তিনি তাদের বায়তপাহাড়ের ওপর তৃতীয় স্তম্ভ স্থাপনের দাবী পূরণ করবেন আর সে স্থানটি হল যেখানে আজ কুদ্স শরীফ অবস্থিত। বেগীনের দেয়া ওয়াদা, ব্যক্তিগত ওয়াদা ছিল না। এটি ছিল ইসরাইলী সরকার কর্তৃক দেয়া প্রতিশ্রুতি- প্রথমতঃ আকসাকে ইহুদী করণের, দ্বিতীয়তঃ তার ইসলামী চিহ্নকে মুছেফেলার এবং তৃতীয়তঃ ধর্মান্ধদের এসব পবিত্র স্থানকে কলুসিত করার সব রকমের সুযোগ করে দেয়ার।

উদাহরণ স্বরূপ এখানে ইঙ্গিত করাই যথেষ্ট যে ইসরাইলী সুপ্রীম কোর্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ সালে রায় দেয়া হয়, কুদ্স শরীফের ওপর ইহুদী মালিকানা রয়েছে। আরও ঘোষণা এসেছে যে, ইহুদীদেরকে মসজিদে প্রবেশের পথ খুলে দিতে হবে এবং ইসলামী ওয়াক্ফ কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্মকান্ডকে সংস্কার ও গাছপালা লাগান এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন বাধাগ্রস্ত করতে হবে। পাহাড় স্তম্ভের রক্ষক নামক ধর্মান্ধ জঙ্গী সংগঠনটি এই রায়ে সবচেয়ে বেশী খুশি হয়েছে, কেননা এই জঙ্গী সংগঠনই এখন মসজিদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে।

কয়েক বছর হয়ে গেল ইসরাইলী লেবার দলের শাসনকাল, যা থেকে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যক্রমকে ভাগাভাগি করাই আছে, দশজন সরকার প্রধানের মাঝে। যার শুরু হয়েছে ইবনে গোরিওন থেকে নেতানিয়াহু পর্যন্ত। এর শুরু মসজিদুল আকসার নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গ খননের মাধ্যমে। শ্যারন তার অপরাধের কথা বেমালুম চেপে যায় এবং বিশ্ব জনমতকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে ১৯৯৬ সালে এই সুড়ঙ্গপথ খুলে দেয়, যার উপরে রয়েছে মসজিদুল আকসা ও সোনালী গম্বুজ।

এসবই হল কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। এতেই বুঝা যায় ইসলামী পবিত্র স্থান সমূহকে ধবংস করার ইসরাইলী চক্রান্তের নমুনা এবং খৃষ্টীয় পবিত্র স্থান সমূহকেও সেই সাথে ধ্বংস করার চক্রান্ত। আমেরিকার কংগ্রেস যদি এসবকে

ভুলে যায় এবং ইসরাইলী ধারনাকে আইনে পরিণত করে তাহলে তারা না বুঝেই ইসলামী ও খৃষ্ট ধর্ম বিশ্বাসের সাথে এক বিরাট সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, বিগত ১৪ শতাব্দী ধরে আকসা শরীফ ইসলামী কর্তৃত্বের অধীনে সবচেয়ে ধর্মীয় সহনশীলতা প্রত্যক্ষ করেছে। (আহরাম ১০/০৭/৯৭ পৃষ্ঠা ১০, লেখক আহমাদ ইউসুফ আলকার'আ, জেরুজালেম এবং অমেরিকান কংগ্রেসী বিধান)

কুদ্সের উপর ঐতিহাসিক অধিকারের ব্যাপারে আমেরিকা তার ইসলামী উম্মত বিদ্বেষী মুখোশ উম্মোচন করেছে। তেমনিভাবে সে নগ্নভাবে ইসরাইলের পক্ষ অবলম্বন করেছে এবং ইসরাইলের ভ্রান্ত ও মিথ্যা দাবীকে অন্ধভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং ইসরাইলী আক্রমণ ও বাড়াবাড়িকে সমর্থন করছে। পক্ষান্তরে সে দাঁড়িয়েছে লিবিয়ার বিরুদ্ধে, ইরাকের বিরুদ্ধে (ইতিমধ্যে আক্রমণ করে গোটাদেশটাকেই দখল করে নিয়েছে), পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং এমন প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যে আমেরিকাকে প্রশ্ন করছেঃ কেন? বলে, আর যে তাকে মুখের ওপর না বলেছে, তার কথা বাদই দিলাম।

আমরা যেন আমেরিকাকে চিনতে পারি এবং তারাও চিনতে পারে যারা তাকে বন্ধু রাষ্ট্র বলে মনে করে এবং যারা এখনও তাকে শান্তির বাহক বলে মনে করে। সত্যিই সে একবাক্যে শান্তির বাহক একমাত্র ইসরাইলের জন্য শান্তির বাহক।

'তোমরা হতোদ্যম হয়োনা এবং সন্ধির আহবান করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে'

আমরা যখন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রাথমিক স্তরের ছাত্র ছিলাম তখন আমরা সবাই মুসলমানদের প্রথম সমস্যা ফিলিস্তীনের ভূমি সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। নবুওয়ত ও বরকতের ভূমি ।

এ বিষয়টিকে আমার গুরুত্ব দেয়া থেকেই বুঝা যায় যে, আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায় সেই মহাপুরুষের কর্মকান্ডের সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিই যিনি ছিলেন এই সমস্যার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার, যার সবচেয়ে বড় কাজই ছিল ফিলিস্তীন ও মসজিদুল আকসাকে রক্ষা করার সংগ্রাম, যাকে আল্লাহ দিয়েছিলেন প্রখর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। তিনি হচ্ছেন শহীদ হাসানুল বান্না (রহ.)।

আমরা বিক্ষোভ মিছিলে অংশ গ্রহণ করতাম এবং আগুন ঝরা বক্তৃতা দিতাম, জনতার উদ্দেশ্যে উত্তেজক ইসলামী সঙ্গীত পাঠ করতাম এবং লোকজনকে ফিলিস্তীনের জন্য ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে, বিশেষ করে প্রতি বছর ২রা নভেম্বরে বেলফোরের কুখ্যাত অঙ্গীকার উপলক্ষে, "যার সামর্থ নেই সে ওয়াদা করে তার জন্য যে এর উপযুক্ত নয়।" বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রীর এই ওয়াদার উপর ফিলিস্তীনের প্রধান মুফতী শায়খ আলহাজ আমীন হোসাইনী এ বলে মন্তব্য করেন, "ফিলিস্তীন কোন গোষ্ঠীহীন দেশ নয় যে, এমন এক জাতিকে গ্রহণ করবে যাদের কোন দেশ নেই।"

১৯৪৮ সালে যখন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য পথ খোলা হল আমরা তখন একদিকে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করলাম অন্যদিকে সাধারণ লোকদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলাম। আমাদের অনেক ভাই ও বন্ধু চলে গেল

---

* ধিকৃত অসলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর কাতারের একটি পত্রিকায় এ লেখাটি ছাপা হয়।

যুদ্ধের ময়দানে। যাদের ভাগ্যে আল্লাহ শাহাদাত লিখেছিলেন তারা শহীদ হলেন। আর যাদের হায়াত ছিলো তারা বন্দী হলেন। আমরা দেখলাম খিয়ানতকারীদের খিয়ানত এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের মুখে আরবের সাতটি দেশের বাহিনীকে ইহুদী সন্ত্রাসী গ্রুপ গুলোর হাতে চরম পরাজয় বরণ করতে।

কথিত ইসরাইল

আমাদের সমকালনি যুবসমাজের ভাগ্যে ছিল যে তারা ফিলিস্তিনে ক্রমাগত রক্তাক্ত বিপর্যয় ও ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করবে।

আমরা ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তীন বিভক্তির সিদ্ধান্ত দেখলাম যে সিদ্ধান্ত আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে প্রত্যাখান করেছিলাম। কেননা কেউই তার বসত বাড়ীকে জবরদখলকারী জালেমদের মাঝে ভাগাভাগি করাটাকে গ্রহণ করতে পারে না। পরে যে সব ঘটনা ঘটল তাতে আমরা অনেকেই মনে করলাম যা আমরা প্রত্যাখান করেছিলাম তা যদি কবুল করতাম তাহলেই ভাল হতো।

এরপর ১৯৪৮ সনের ১৫ মে তারিখে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং লাখ লাখ ফিলিস্তিনীকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত করে তাদেরকে বিভিন্ন অঞ্চলে ও দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হলো।

দেখলাম ইসরাইলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে যাকে আমরা বেশ কিছু বছর বলতে থাকলাম 'কথিত ইসরাইল রাষ্ট্র।' এরপর আমরা লজ্জিত হয়ে পড়লাম যখন দেখলাম এটি সর্বক্ষেত্রে দাপটের সাথে এগিয়ে চলছে। আমাদের শুধু চিল্লা-চিল্লি ও বিক্ষোভ করা এবং জাতিসংঘের নিকট অভিযোগ ও স্মারক লিপি পেশ করা ছাড়া আর কোন ক্ষমতাই থাকল না। অতপর আমরা 'কথিত' বিশেষণটি মিটিয়ে ফেললাম যখন অবস্থা এরকম হল যে, আমরাই 'কথিত' হয়ে পড়েছি।

এরপর দুটি বিরাট বিপর্যয় সংঘটিত হলো, প্রথমটি ১৯৪৮ সালে আর দ্বিতীয়টি ১৯৬৭ সালে যাতে ইসরাইল ফিলিস্তীনের যে অংশটুকু বাকী ছিল তাও দখল করে নেয়। পশ্চিম তীর যাতে বাইতুল মুকাদ্দাস রয়েছে, গাজা, সিনাই অঞ্চল, গোলান মালভূমি এবং দক্ষিণ লেবানন।

বিপর্যয়ের নতুন অধ্যায়

আল্লাহর ফায়সালা রয়েছে এ উম্মতের ব্যাপারে যে, তা একেবার নিঃশেষ হয়ে যাবে না। এ উম্মত হল জন্মদাতা যা বড় বড় বীর মুজাহিদ জন্ম দিয়ে যাচ্ছে যারা ঝন্ডাকে কখনো মাটিতে পড়ে যেতে দেয় না, যার ফলে পবিত্র ভূমিকে -যাতে আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখেছেন- মুক্ত করার লক্ষ্যে শুরু হয় প্রতিরোধ আন্দোলন। এর শুরু হয়েছে 'ফাতাহ্' থেকে এবং বর্তমানে এসে পৌঁছেছে ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন 'হামাস'-এ এসে এবং 'ইন্তিফাদা' শুরু হয়েছে যা সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে এবং ইসরাইলকে কাঁপিয়ে তুলেছে। এর কারণ হল এটি শুরু হয়েছে মসজিদ থেকে যার নাম ইসলামী ইন্তিফাদা। এর ঝান্ডা হলো আল কুরআন এবং শ্লোগান হলোঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' (আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আল্লাহ্ মহান)। এর যোদ্ধারা এ বলে গান গায়, 'খায়বার খায়বার ইয়া ইয়াহুদ, জায়শু মুহাম্মাদ সাওফা ইয়াউদ। ('হে ইহুদী! খায়বার খায়বার। মুহাম্মদের সৈন্যরা ফিরেছে আবার'।)

কিন্তু আমরা আজ এক নতুন অধ্যায় প্রত্যক্ষ করছি যা কোনদিন আমরা কল্পনাও করিনি, যা সব হিসাব পাল্টিয়ে দিয়েছে এবং সব সূত্রই উল্টিয়ে দিয়েছে এবং বিগত অর্ধশত বছরের সকল মৌলনীতিকে লংঘন করেছে, যার ওপর আমাদের যুবকেরা বড় হয়েছে এবং ছোটরা বড় হয়েছে আর প্রৌঢ়রা আরও বৃদ্ধ হয়েছে ঃ ইসরাইল হল রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিপজ্জনক এবং এজন্য অনেক বই-পুস্তকও লেখা হয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গঠন করা হয়েছে, সেমিনার, সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা কতবার শুরু করেছি এবং আমাদের ভূমিকে পূর্ণ অধিকারের কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছি এবং বলেছি যে ,শত্রুতাকারী ও জবরদখলকারী কখনো বৈধ অধিকারী হতে পারে না। আর যা বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত তা অবশ্যই বাতিল, অবৈধ.... ইত্যাদি। অতঃপর লাঞ্ছিতদের দেখা যায় যে, ৫-৬-১৯৬৭ সালের আক্রমনের পরের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট। তারা তাদের রাজনীতির ভিত্তি করতে চায় স্রেফ শত্রুতার চিহ্নকে দূর করতে এবং ১৯৬৫ সালের ৫ই জুনের পূর্ব সীমানা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে অর্থাৎ নতুন শত্রুতা

যেন পূরাতন শত্রুতাকে বৈধতা প্রদান করেছে, ১৯৬৭ সালের শত্রুতা ১৯৬৮ সালের শত্রুতাকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

এরপরে আগুনে আরও ঘৃতাহুতি দেওয়া হল, সেটি হল যে, শুধুমাত্র ইসরাইলী শাসনের আওতাহীন স্বায়ত্বশাসন নিয়েই কেউ কেউ সন্তুষ্ট।

অতঃপর সর্বশেষ আমরা দেখলাম আজকে লজ্জাস্কর সিদ্ধান্ত। সমাধানের ভিত্তিতে জেরুযালেমের পতন এবং ফিলিস্তীনের ভূমির কিয়দাংশ থেকে জবরদখলকারীকে ছাড় প্রদান আর অর্ধকোটি উদ্বাস্তু তাদের ভিটে মাটিতে ফিরে আসার অধিকারের ব্যাপারে জলাঞ্জলি দিতে এবং দিরে ইয়াসীন ও সাবরা শাতিলায় নরহত্যা পরিচালনাকারীদের সাথে হাত বাড়িয়ে মুসাফাহা করতে। এসবই হল ফিলিস্তীনে মোট ভূমির মাত্র শতকরা ২ ভাগের বিনিময়ে। যেমন ঃ প্রাচীন যুগের আরবরা বলেছিল, যদি উট না হয় তাহলে ভেড়াতো পাবো।

আমরা জানি যে, অনেক জাতিরই এমন ক্রান্তিকাল আসে যখন সে বাধ্য হয়ে চুক্তিপত্রে বা সন্ধিতে স্বাক্ষর করে, যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পরে যখন আর আত্মসমর্পন ছাড়া কোন পথই থাকেনা। যেমনটি জাপান পারমানবিক বোমা হামলার পর করেছে এবং জার্মানী হিটলারের পরাজয়ের পর করেছে।

কিন্তু ঘোড়সোয়ারী কি আত্মসমর্পন করতে পারে? যে তার তারবারি উঁচু করে ধরে আছে, তীর নিশানা করে রেখেছে, ঘোড়াকে সামনের দিকে ছুটাচ্ছে। আর আত্মসমর্পন কি বিজয় বলে গন্য হবে? লোকজন কি তার পক্ষে শ্লোগান দিবে এবং তাকে হাততালি দিয়ে বরণ করে নিবে? এটা আমরা কোন যোদ্ধা এবং ঘোড়সোয়ারীর ইতিহাসে দেখতে পাই না। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব যখন ঘোড়সোয়ারী পুতুলে পরিণত হবে, আর ঘোড়া গাধাতে এবং তরবারি চাকুতে রূপান্তরিত হবে।

যুবকদের জন্য মায়া হয়

আমার সেসব যুবকদের জন্য মায়া লাগে, যাদের জন্য আমরা জিহাদের গান গেয়েছি, যাদের বিজয় কামনা করেছি, যাদের অন্তঃকরণ, চক্ষু মসজিদুল আকসার পানে নিবদ্ধ, কুব্বাতুল সাখরা (সবুজ গম্বুজ)-এর দিকে নজর। রাসূলের ইসরাস্থল এবং প্রথম কিবলার পানে, যাদের মনে চিন্তায় ছিল

যায়নবাদীদের প্রতি ঘৃণা এবং ইসরাইলের প্রতি যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দখলদারিত্বের উপর, ইজ্জত আব্রু নষ্ট করে লোকজনকে বিতাড়িত করে। হঠাৎ আমরা এসবকে মুছে ফেললাম কলমের এক খোঁচায়, ফলে শত্রু হয়ে গেল বন্ধু, দখলদার হয়ে গেল বৈধ এবং শত্রুতা হয়ে গেল গ্রহণীয় অথচ দেশ এখনও মুক্ত হয়নি, উদাস্তুরা তাদের বাড়িঘরে ফিরতে পারল না, আর মসজিদুল আকসা এখনো বন্দী হয়ে থাকল। মনে হয় যেন আমরা এই হতভাগ্য মিসকিন প্রজন্মকে বলছি, "আমরা তোমাদেরকে যা বলতাম তা বিশ্বাস করো না। গতকাল যাকে জিহাদ বীরত্ব বলতাম তা হয়ে গেল আজ উগ্রতা ও সন্ত্রাস। যাকে গতকাল বলতাম রক্ত পিপাসু সে আজ ভদ্র ও সম্মানিত। আমাদের নিকট কোন কিছুই মৌলিক বা স্থির নেই। যা কিছু সত্য তা-ই বাতিল বলে গণ্য হতে পারে। ঘরের জানালা খুলে দাও যেন ইসরাইলের বাতাস এসে লাগে। ঘরের দরজা খুলে দাও যেন ইসরাইলী পন্য তোমাদের ঘরে প্রবেশ করে। সেই সাথে ইসরাইলী মেয়েরাও আর ফলশ্রুততে ইসরাইলী এইডস।"

নিষ্ফল চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী ইসহাক রাবীন ওয়াশিংটনে কথিত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে জোর দিয়ে বলেন, "জেরুজালেম চিরদিনই ইসরাইলের রাজধানী থাকবে এবং ইহুদী জাতির জন্য চিরস্থায়ী ভাবে আর কোনদিনই এর ওপর ফিলিস্তিনী পতাকা উড়বে না।" এর দ্বারা সে ফিলিস্তিনীদেরকে একটা মূলনীতি জানিয়ে দেয় যার কোন পরিবর্তন ঘটবে না বা ইসরাইলী রাজনীতিতে পরিবর্তন হবে না। সুতরাং ফিলিস্তিনীরা যেন আল-আকসার বিষয়টি ভুলে যায় এবং একে তাদের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলে। বিশ্ববাসীর সামনে সে এটিকে জোর দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানেও বলে, "আমরা এসেছি ইহুদী জাতির ঐতিহাসিক ও চিরস্থায়ী রাজধানী কুদ্স থেকে আমরা এসেছি।" আবু আম্মার ও আবু মাজেন তাদের ভাষণে বলেন, "আমরা আশা করছি যে, কঠিন ঝুলন্ত সমস্যাসমূহ পরবর্তী পর্যায়ে সমাধান হবে তা হলঃ জেরুজালেম সমস্যা, উদ্বাস্ত সমস্যা, বসতি স্থাপন সমস্যা এবং সীমান্ত সমস্যা।" যদি এগুলো ঝুলন্ত সমস্যা হয়, তাহলে কোন সমস্যাগুলোর সমাধান হলো?

দুই ব্যক্তি ও দুই বক্তব্যের মাঝে পার্থক্য

সত্যি কথা হলো আমি সেদিন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করছিলাম যাকে তারা দেখছে উৎসব হিসেবে আর আমি দেখছি শোক হিসেবে, বিপর্যয় হিসেবে।

আমি দুটি অবস্থান ও দুটি বক্তব্যের মাঝে তুলনা করেছিলাম। আরাফাতের ও রাবীনের অবস্থান ও তাদের বক্তব্য। দুঃখজনক হল যে, এর মাঝে পেলাম বিরাট ব্যবধান। রাবীনের অবস্থান ছিল উদ্ধত ও বলিষ্ঠ দাতার মত আর আরাফাতের অবস্থান ছিল অনুগত কৃতজ্ঞতাকারীর মত। এমনকি সে তার বক্তব্য শেষ করে ধন্যবাদ শব্দটি বার বার আওড়িয়ে। (তিনবার ইংরেজীতে)